# মানবরচিত বিধানে বিচার

## ছোট কুফর নাকি বড় কুফর?

Salih Ibrahim

## আল্লাহর আইনবিরোধী বিচারব্যবস্থা: ইসলাম কী বলে?

বিষয়টি নিয়ে অনেকের মাঝেই বেশ বিতর্ক দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে, যারা এটাকে কোনোভাবেই কুফর মানতে চায় না। বিপরীতে কিছু লোক সকল ক্ষেত্রেই এটাকে কুফর বলে ধারণা করে। এদিকে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ আল্লাহর ﷻ দেওয়া আইন অনুসারে বিচার না করলে সে কাফির বা ফাসিক বা জালিম। এগুলোরই বা রহস্য কী? একই অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনরকম বিধান কেন? এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো, মানবরচিত আইনে বিচার করা কুফরে আকবার বা বড় কুফর কিনা, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে এভাবে উত্তর হবে যে, যদি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সে আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থে কখনো কখনো ভিন্ন আইনে বিচার করে অথবা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তাহলে সে কাফির নয়; বরং জালিম বা

ফাসিক। এ ধরনের কুফরকে বলা হবে 'কুফর দুনা কুফর'। অর্থাৎ এর কারণে সে মারাত্মক গুনাহগার হলেও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে না। আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর ﷻ আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিয়মিতভাবে সে আইন অনুসারেই বিচার ফয়সালা করা হয়ে থাকে কিংবা সে আল্লাহর ﷻ আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকেই সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে অথবা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে এ আইন অনুসারে ফয়সালা করাকে বাধ্যতামূলক বিশ্বাস করে তাহলে তার কুফর ও ইরতিদাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট। এখানে তার কুফরির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটাকে 'কুফর দুনা কুফর' বলে যারা বিষয়টিকে হালকা করে প্রচার করে, তারা নিশ্চিত দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে তাদের প্রভুদের খুশি করতে চায়। আমরা এদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমাদের থেকে মুক্ত।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে তিন জায়গায় আলাদা আলাদা করে বলেছেন, যারা আল্লাহর ﷻ বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না, তারা কাফির বা ফাসিক

বা জালিম। তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে এ তিন শ্রেণির মাঝে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. কাফির: এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যভিচারীর বিচার করার সময় সকল সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু বিচারক তাকে শারিয়াহসম্মত শাস্তি না দিয়ে মানবরচিত অন্য কোনো শাস্তি দেয় অথবা জেল জরিমানা করে। সে এ কথা বলে যে, আমরা এ ধরনের অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য এটাই আমাদের শাস্তির নির্ধারিত ও চূড়ান্ত বিধান। তাহলে এতে সে আল্লাহর ﷻ আইন ও বিধানকে কার্যত বা মৌখিকভাবে অস্বীকার করায় পরিপূর্ণরূপে কাফির সাব্যস্ত হবে।

২. জালিম: এর উদাহরণও একই। তবে পার্থক্য হলো, এই বিচারক আল্লাহর ﷻ বিধান মানে, রাষ্ট্রীয় আইনেও তা লেখা আছে এবং ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে সে আল্লাহর ﷻ নির্ধারিত শাস্তিকে অস্বীকারও করে না। কিন্তু সে কিছু লোককে শারিয়াহ নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করে না। কারণ, তার সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের ভালো সম্পর্ক আছে, অথবা তাদের

সামাজিক মর্যাদা উঁচু, অথবা তারা তাকে ঘুষ দিয়েছে ইত্যাদি। তাহলে এমন বিচারক জালিম হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. ফাসিক: তার উদাহরণ হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর ﷻ বিধিবিধান চালু আছে এবং সে শারিয়াহ অনুযায়ী বিচারও করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের জন্য অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কিছু অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে, যাতে এ শাস্তি বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা যায়। যেমন, দেখা গেল, ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী আছে, তথাপিও বিচারক অপরাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বলল, এই সাক্ষী ভালোভাবে ঘটনা দেখেনি, অথবা অমুক সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ নয় ইত্যাদি। এভাবে সে সাক্ষীদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধাপ্রদান করল। তাহলে এমন বিচারক ফাসিক বলে বিবেচিত হবে।

এই বিষয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন :

وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة.

“আল্লাহর ﷻ আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহর ﷻ বিধান ছাড়া অন্য আইনে বিচার ফয়সালা করে নিজেকে গুনাহগার ভাবলে তার ব্যাপারে যে বলা হয়েছে ‘কুফর দুনা কুফর’, এটা কেবল ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার থেকে তা এক-দুইবার প্রকাশ পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যথাযথভাবে (আল্লাহর বিধানের বিপরীত) আইনকানুন তৈরি করবে এবং তা মেনে চলবে তখন তা অবশ্যই কুফর বলে বিবেচিত হবে; যদিও সে একথা বলে যে, (এর কারণে) আমি গুনাহগার হয়েছি এবং শারিয়াহর ফয়সালাই অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ। অতঃপর সে (শারিয়াহর) চূড়ান্ত, প্রমাণিত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত আইনকে বাদ দিয়ে সেটাকে (মানবরচিত আইনকে) মূল বানিয়ে নিয়েছে। অতএব, তা এমন কুফর বলে গণ্য হবে, যা তাকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়।”

[ফাতওয়া ওয়া রাসায়িল, মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম: ১২/২৮০, ফাতওয়া নং ৪০৬০, প্রকাশনী: মাতবাআতুল হুকুমাহ, মক্কা]

[শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর বংশধর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম আলুশ শাইখ ছিলেন সৌদি রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান বিচারপতি। এবং তাওহীদ সম্পর্কে কঠোর, এবং বর্তমান সৌদী অধিকাংশ আলিমদের মতো শাসককেন্দ্রিক ইরজা থেকে মুক্ত।

যাইহোক, বর্তমান সৌদি আলিমরা এমনকি সর্বোচ্চ ফাতওয়া বিভাগ থেকেও মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করাকে কুফর আল-আসগর বলেছে তা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাসীর, ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহর মতো ইমামদের ফতোয়ার বিপরীত।]

তিনি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) আরো বলেন,

مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلانه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله. فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعا مع الله فقد أشرك في الرسالة والالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفرا من إليهودي والنصراني.

“আইন আদালতের বিচার ব্যবস্থায় যেসব আইন ব্যবহার করা হয়, তা এই ধরনের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তারা এই আইনগুলোকে রাসূলের ﷺ সমতুল্য করে নিয়েছে, যার ভিত্তিতে দলিল লেখা হয়, অমুকের অধিকার অমুকের এবং বিধান তমুকের। ফ্রান্স থেকে আসা আইনকে যেন রাসূলের ﷺ সমতুল্য করে দেখা হয়।

যদি আলিম সমাজের মধ্যে এমন অবস্থা হয়, তাহলে শয়তান, আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে আসা বিধানগুলোর অবস্থা কেমন হবে? বিচার-বিধানের ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা ছাড়া আর কোনো বিধান নেই।

সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো আনুগত্য করে, সে রিসালাহ ও উলুহিয়্যাহ তে শিরক করলো। এই দুটির কোনো একটিতে শিরক করলেই তা কুফর হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি পরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ বিধান। যে ব্যক্তি এর প্রবর্তন করে, সে মুরতাদ এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চেয়েও তার কুফর আরও গুরুতর।”

[ফাতওয়া ওয়া রাসাইল সামাহাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম ইবনু আব্দুল লতিফ আশ শাইখ ১২/২৮০]

এ বিষয়ে অনেক উলামা ইকরাম এমনই বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের তাফসির ও মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর ﷻ বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা আল্লাহর ﷻ সাথে এক জঘন্য ও স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। অথচ বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ মুসলিম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে মানবরচিত আইনে পরিচালিত কোর্টের সামনে বিচারের জন্য ভিড় জমায়। উম্মাহ'র ফকিহগণ আল্লাহর ﷻ বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দ্বারা বিচারকারীদেরকেই শুধু কাফিরই বলেননি; বরং তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী আলিমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন:

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“আর যখন কোনো আলিম কুরআন-সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং আল্লাহ ﷻ ও রাসুলের ﷺ বিরুদ্ধাচরণকারী বিচারকের অনুসরণ করে, তখন সে একজন মুরতাদ ও কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।”
[মাজমুউ’ল ফাতওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ: ৩৫/৩৭৩, প্রকাশনী: মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা]

***<u>Note:</u>*** এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিচার ফয়সালা এবং বিধান। বিচার ফয়সালা হলো বিধানেরই একটি অংশ বিশেষ। আর বিধান হলো আল্লাহর ﷻ পূর্ণ আইনব্যবস্থা। সুতরাং শুধু বিচার ফয়সালা থেকে বিধান বাদ দেওয়া আর সম্পূর্ণ বিধানকেই পরিত্যাগ করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কাজেই যদি কোনো শাসক আল্লাহর ﷻ শারিয়াহ অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা না করে তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন চলে আসে যে, সে কি কাফির নাকি মুসলিম? সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে শরিয়াহকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাস্তবায়ন না করা তার বড় কুফরিকেই আবশ্যক করে। আর যদি সংবিধানে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর

ﷻ বিধান বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে শারিয়াহ বাদ দিয়ে সে বিচার করে তাহলে তা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সেটা হবে এক দৃষ্টিকোণ থেকে কুফর। এটাকেই বলা হয় ‘কুফর দুনা কুফর’ তথা ছোট কুফুর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি সংবিধান হিসাবে শারিয়াহ বলবৎ থাকে তাহলে শারিয়াহ আইন বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে ছোট কুফর। আর যদি সংবিধানকে শারিয়াহ ছাড়া অন্য কোনো আইন বা তন্ত্র দ্বারা পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেটা হবে বড় কুফর।

***<u>Note:</u>*** আরবিতে حكم (হুকুম) শব্দ শুধু শাসন বোঝায় না, বিচারও বোঝায়। কুরআনের "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ"
[5:44] এখানে ফকিহ ও মুফাসসিরগণ বলেন, এর মধ্যে শাসক ও বিচারক উভয়েই অন্তর্ভুক্ত, কারণ দুজনেই শারীয়াহ কার্যকর বা বাতিল করতে পারে।

আল্লামা ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর যুগে যখন তিনি এমন বাস্তবতা অবলোকন করেছিলেন তখন ঠিকই তিনি এ বিষয়ে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের বড় কুফরির কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

এক্ষেত্রে মাসআলা গোপন রাখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন:

وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبسها من شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وغيرها، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نظره وهواه، فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ.

“যেভাবে তাতার শাসকরা চেঙ্গিস খানের প্রণীত সংবিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করতো, যা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের ‘ইয়াসিক’ নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘ইয়াসিক’ এমন একটি আইনগ্রন্থ, যা বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ও চিন্তাধারারও অনেক আইন সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই এটা তাদের মাঝে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে স্বীকৃতি পায়। তারা আল্লাহর ﷻ

কিতাব ও রাসুলের ﷺ সুন্নাহর ওপর এটাকে প্রাধান্য দিত। অতএব, যে কেউ এমনটা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ﷻ ও তার রাসুলের ﷺ বিধানের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং কমবেশি কোনো বিষয়েই তিনি ছাড়া কেউ ফয়সালা করতে পারবে না।"

[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/১১৯, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত]

***<u>Note:</u>*** শাসন/বিচার কার্যের উৎস হিসেবে ইসলামী শারিয়াহকে গ্রহণ করার পর, শাসক যদি কোনো জুলুম করে অথবা কোনো বিচারক যদি কুপ্রবৃত্তি অনুগামী হয়ে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার না করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ছোট কুফরী হবে। আর এর পক্ষে সালাফদের থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য উলামাদের বক্তব্য বিদ্যমান।

শাইখ আব্দুল্লাহ আল জারবূ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

"'আল্লাহ ﷻ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতিরেকে বিচার করা' আর 'আত-তাহাকুম ইলাত ত্বাগূত'

(তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া) এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম বিষয়, আল্লাহ ﷻ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত বিচার করা- এর ধরণ হলো, বিচারক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। মনোযোগ দিন 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' يلتزم শব্দটির প্রতি।
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে আল্লাহর শারিয়াহর নিকট বিচার চাওয়ার (তা দিয়ে বিচার করার) ব্যাপারে।

যেমন: সে বলে, 'আমরা আমাদের আইন গ্রহণ করি, এতে নির্ভর করি কুরআন ও সুন্নাহর উপর।' যখন তার কাছে কোনো মামলা আসে, তখন সে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে লক্ষ্য করে, আর তার জন্য রায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি আহমাদের পক্ষে, উদাহরণস্বরূপ ধরুন আহমাদ।

কিন্তু সে (সঠিক রায় দেওয়া থেকে) বিচ্যুত হয়ে যায়, আহমদের পক্ষে রায় দেয় না, সে যা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝেছে, তা অনুযায়ী বিচার করে না, (বরং) তা থেকে সরে যায়। লালসা, ঘুষ বা শত্রুতার কারণে (শরীয়াহর) বিপরীত বিচার করে।

এটি খুলাফা আর-রাশিদিনের যুগের (কিছু) বিচারক করতেন, বনু উমাইয়ার যুগে এবং এখন সৌদি আরবেও কিছু বিচারকের মাধ্যমে ঘটতে পারে, যারা আল্লাহর শারীয়াহ দিয়ে বিচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন যে এটা হলো ফিসক, জুলুম, আর কুফর হবে যদি সে তা হালাল করে নেয়।

সে আল্লাহর শারিয়াহ অনুযায়ী বিচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, বরং সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের বিধান দিয়ে বিচার করতে, (হতে পারে তা) পার্লামেন্ট, ইয়াসিক্ (তাতারদের সংবিধান), অথবা তার নিজ ইচ্ছা-প্রবৃত্তি।

অন্যদিকে 'তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া' বিষয়টি, তা হলো- সে মামলাকে আল্লাহর শারিয়াহ ব্যতীত অন্য শারিয়াহর কাছে উপস্থাপন করে বা আল্লাহর শারিয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো শারীয়াহ থেকে (এটার বিচার) গ্রহণ করে। এটাকে বলা হয় 'আত-তাহাকুম ইলাত ত্বাগূত' (তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া)। এটা ভিন্ন আরেকটি বিষয়;

(এবং) এটি শিরক ও কুফর। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ یَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَی الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ یَّكۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَ یُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০]

তাগুতের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া, তারা তাদের বিচার (এর ক্ষেত্রে) তাগুতের বিধানের ওপর ভিত্তি করে। এটি শির্ক ও কুফর। এবং এটার মতো হলো মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করা।’

[শাইখ আব্দুল্লাহ আল-জারবূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা মুনাওয়ারার উসূল আদ-দীন (আকীদা) অনুষদের প্রধান ছিলেন। তাছাড়া তিনি শাইখ সালিহ আল-ফাওযান, শাইখ আব্দুল্লাহ আল-ঘুনাইমান, শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি থেকে তাজকিয়া প্রাপ্ত।]

শাইখ সালিহ আল ফাওযান বলেন,

وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد.

"কেউ যদি ইসলামী শারিয়াহকে সরিয়ে দিয়ে মানবরচিত আইনকে তার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তা এই বিষয়ের দলিল যে সে মানবরচিত আইনকে শারীয়াহ থেকে উত্তম ও অধিক উপযোগী মনে করে। আর নিঃসন্দেহে এটি এমন বড় কুফর যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং এটি তাওহীদের পরিপন্থী।"
[আকিদাতুত তাওহিদ, ফাওযান, পৃষ্ঠা ১২২]

আল্লাহর ﷻ আইনের বিপরীত আইন দিয়ে বিচার করার এ বিধান বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেকেই

জানেন না, আর কিছু মানুষ জানলেও নিরাপত্তা বা সমালোচনার ভয়ে মুখ খোলেন না। অথচ ইমান বাঁচানোর তাগিদে বিষয়টি জানা সবারই প্রয়োজন ছিল। কেউ যদি মুখ না খোলে, তাহলে মানুষ কীভাবে জানবে দ্বীনের বিধান ও তা অস্বীকার করার ভয়ংকর পরিণতি? আমরা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে এসব বিধানের ব্যাপারে নীরব থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিন আমরা কেউ-ই কিন্তু মুক্তি পাব না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআনের বিধান গোপন করে এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের উদরে আগুনই ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তাআলা না তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।” [সুরা আল-বাকারা: ১৭৪]

## তাগুত বলতে কী বুঝায় এবং কত প্রকার ও কী কী?

যারা আল্লাহর ﷻ বিধান ছাড়া মানবরচিত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন কার্য পরিচালনা করে তারাই তাগুত।

❑ তাগুতের সংজ্ঞা বা পরিচয়:
ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন:

مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ

"তাগুতের অর্থ হলো, বান্দা যা কিছুতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। চাই সে ব্যক্তির ইবাদত করা হোক বা অনুসরণ করা হোক বা আনুগত্য করা হোক।"

❑ ইবনু কাইয়িম (رَحِمَهُ اللَّهُ) আরও বলেছেন,

“وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شيئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ”

“তাগুত অনেক। আর তাদের প্রধান পাঁচটি:
১. অভিশপ্ত ইবলিস।
২. যে ব্যক্তির ইবাদত করা হয় এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।
৩. যে মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে ডাকে।
৪. যে গায়েব (অদৃশ্য) কোনও কিছু জানার দাবি করে।
৫. এবং যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন (আল্লাহর ﷻ কিতাব ও রসুলের ﷺ সুন্নাহ) তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে (অর্থাৎ মানব রচিত আইন) দ্বারা বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করে।”
[ই'লামুল মাওকী’ইন, পৃষ্ঠা ৪০]

❑ অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিরুদ্ধাচরণ করে মানবরচিত আইনকানুন দ্বারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করে সে তাগুত।

এর কারণ আল্লাহ ﷻ একটি শারিয়াহ ও বিধানসমূহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি ভালো জানেন কোনটি তার বান্দাদের জন্য কল্যাণকর, কোনটি তাদেরকে অন্যায় বা ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কোনটি তাদের উপকার করে। সুতরাং যখন কোনও ব্যক্তি আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার বা শাসন কার্য পরিচালনা করে, তখন সে তাগুত।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:
“وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”
“যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক।” [মায়িদা: ৪৭]

তিনি আরও বলেছেন:
“وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”
“যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই জালিম।” [মায়িদা: ৪৫]

এবং তিনি আরও বলেছেন:
“وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ”

“যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।” [মায়িদা: ৪৪]

❑ আল্লাহর আইন ছাড়া মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার বিধান:

আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর। এটি আয়াত এবং অন্যান্য বহু প্রমাণ থেকে স্পষ্ট, যা মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতী (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন:

«وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ﷺ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم»

“আমরা যে সকল আসমানি দলীল উল্লেখ করেছি, তা থেকে চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট হয় যে, যারা শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মুখে প্রণীত মানবরচিত আইন অনুসরণ করে, যা আল্লাহ ﷻ তার রাসুলদের عليهم السلام

মাধ্যমে প্রণীত বিধানের পরিপন্থী। তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই সন্দেহ করবে, যার অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ﷻ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের মতোই ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত।”

[আদওয়াউল বায়ান, ৩/২৫৯]

তবে এটি নিরঙ্কুশ কুফর নয় বরং এর বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমনটি আলিমগণ উল্লেখ করেছেন। সৌদি আরবে স্থায়ী ফতোয়া কমিটির ফাতওয়ায় বলা হয়েছে:

والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن-ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت

“আয়াতে তাগুত বলতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহর ﷻ কিতাব ও তার নবীর ﷺ সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিচার ফায়সালার জন্য যেসব মানবরচিত নিয়মকানুন, ঐতিহ্যগত প্রথা বা গোত্রপ্রধানদের কাছে

যাওয়া হয়, যাতে তারা সে অনুযায়ী বা গোষ্ঠী প্রধান বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিজস্ব মতানুযায়ী বিচার করে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যেসব আইন আল্লাহর ﷻ বিধানের অনুকরণে বিচার করার জন্য প্রণীত হয়েছে, সেগুলো তাগুতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। [শাইখ ইবনে বাজের সভাপতিত্বে "ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ", ১/৭৮৪]

সাহাবি ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ) বলেন,

"তাগূত হলো কাব বিন আশরাফ নামক এক ইয়াহুদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচার ফায়সালা চাইতে বলা হলে কিছু মানুষ বলতো তারা কাব বিন আশরাফের নিকট বিচার ফায়সালার জন্য যাবে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন, 'তারা তাগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করে।"
[তাফসিরে তাবারি : ৮/৫১১]

আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করার বিষয়টি একটি একক রূপ নয়:

১. যদি কেউ আল্লাহ ﷻ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এবং বিশ্বাস করে যে,

আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা আল্লাহর বিধানের সমতুল্য বা তার চেয়েও উত্তম, অথবা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা উপযুক্ত, তাহলে এটি কুফর।

২. যদি কেউ আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে। তবে সে বিশ্বাস করে যে, সে পাপী ও অপরাধী এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী। তাহলে তার দুটি অবস্থা রয়েছে:
যথা:

▪ক. যদি শারিয়াহকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে তার জায়গায় আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার স্থাপন করা হয়, তাহলে এটি কুফর ও মুরতাদ হওয়ার শামিল। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) সহ অনেক আলিম এ বিষয়ে ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

▪খ. যদি এটি কেবল কিছু ছোটখাটো বিষয়ে হয়, যেখানে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ শারিয়াহ পরিবর্তন করা হয়নি এবং বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তাই সর্বোত্তম, তাহলে এটি কুফর নয় বরং ফিসক (আল্লাহর অবাধ্যতা) ও গুনাহ।

ইবনু কাইয়্যিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেছেন:

«والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين

“সঠিক কথা হলো, আল্লাহ ﷻ যা নাজিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা দুটি কুফরকেই (ছোট কুফর ও বড় কুফর) অন্তর্ভুক্ত করে, বিচারকের অবস্থা অনুসারে। যদি সে বিশ্বাস করে যে, এই বিশেষ ঘটনায় আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে বিচার

করা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু সে অবাধ্যতা বশত তা থেকে সরে আসে এবং স্বীকার করে যে সে শাস্তির যোগ্য, তাহলে এটি কুফর আল-আসগর। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, এটি ওয়াজিব নয় এবং তার এ বিষয়ে ইখতিয়ার (পছন্দ) আছে, অথচ সে নিশ্চিত যে এটি আল্লাহর বিধান, তাহলে এটি কুফর আল-আকবর। আর যদি সে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে এবং ভুল করে তাহলে সে একজন ভুল কারী, তার ভুল কারীদের মতোই বিধান।"

[মাদারিজুস সালিকিন, ১/৩৪৬]

[ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এর বিখ্যাত কিতাব 'আল উসুলুস সালাসাহ' (তিনটি মূলনীতি) -এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাক্বরিবুল উসুল ইলা সালাসাতিল উসুল' কিতাব থেকে নেওয়া। ব্যাখ্যাকারক: ড. মানসুর বিন মুহাম্মাদ আস-সাকুব]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت.

"আর এ কারণেই যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশিত বিধান ছাড়া বিচার ফয়সালা করে, সে হচ্ছে তাগুত।"

[তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৯৪; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন:

“সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহর বিচারে পরিবর্তন করে।” [আদ-দারার আস-সুন্নিয়্যাহ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ১০৯-১১০]

তিনি (رَحِمَهُ اللَّهُ) আরও বলেন,

“তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মাবুদ, নেতা, মুরব্বি, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে।” [মাজমু’আত তাওহীদ]

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-হাম্বালী (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

“যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে তারা তাগুত।”
[মাদারিজুস-সালিকিন]

আল্লাহ ﷻ এর কালাম,

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّٰغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ.

“তারা তাগুতের নিকট বিচার ও ফয়সালা নিতে চায়; অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাকে অস্বীকার করে।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৬০]

আল্লামা ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) এ সম্পর্কে বলেন,

وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم.

“অর্থাৎ মুজাহিদ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন, ‘তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) হচ্ছে, মানুষরূপী শয়তান। যার কাছে মানুষ বিচার ফয়সালার জন্যে যায় এবং তারা তাকে অনুসরণ করে।’”

শাইখ আলি ইবনু খুদাইর আল খুদাইর (فَكَّ اللَّهُ أَسْرَهُ) বলেন,

“যারা আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা অনুযায়ী শাসন করে না এবং মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে,

অথবা তাদের খেয়াল খুশি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী করে, তাহলে তারা কাফির ও মুশরিক।”

আল্লাহ ﷻ বলেন:
وَّ لَا يُشۡرِكُ فِيۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا
“তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন:
اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ
“হুকুম একমাত্র আল্লাহরই”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৭]

“ইজমা অনুযায়ী তাদের কুফর হচ্ছে বড় কুফর। আর এ ইজমার ব্যাপারে ইবনু কাসির ও আধুনিক যুগের আহলুস সুন্নাহের অনেক উলামা বর্ণনা করেছেন।”

আল্লাহ ﷻ বলেন:
وَ مَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ
“যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।” [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪]

এবং আল্লাহ ﷻ বলেন:

اَمۡ لَهُمۡ شُرَکٰٓؤُا شَرَعُوۡا لَهُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَمۡ یَاۡذَنۡۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَ لَوۡ
لَا کَلِمَۃُ الۡفَصۡلِ لَقُضِیَ بَیۡنَهُمۡ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِیۡنَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” [সূরা শুরা, আয়াত: ২১]

“আর আজ আমরা এটাই ঘটতে দেখছি। আপনি দেখবেন, আদালতগুলো মানবরচিত আইন দ্বারা মানুষদের মাঝে বিচার ফয়সালা করে, যদিও কোন কোন স্থানে এর আসল গোমর ফাঁস করা হয় না। আসল বিষয় হচ্ছে এগুলো (অর্থাৎ মানব রচিত আইন) কি অর্থ ও প্রকৃত অবস্থা বহন করে, তাদের দেয়া এসবের নাম ও এর ব্যাপারে ধোঁকাবাজি ধর্তব্যের বিষয় নয়।”

“আর শাসক ও বিচারকের ব্যাপারে বলতে হলে, যদি তারা কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে তাদের লালসা-বাসনার চরিতার্থ হয়ে হুকুম প্রদান করে এবং সেটি (মানবরচিত) আইন, রীতি, প্রতিষ্ঠান, প্রথা অনুযায়ী না হয় তবে তা কুফর দুনা কুফর, নিম্নোক্ত হাদিস অনুযায়ী:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، قَالَ لَوْلاَ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ " . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ .

“বিচারক তিন প্রকারের: দুজন জাহান্নামে এবং একজন জান্নাতে। জান্নাতে যিনি যাবেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সত্য জানেন এবং সে অনুযায়ী বিচার করেন; জাহান্নামে যাবেন, যে ব্যক্তি জানার পরও অন্যায়ভাবে বিচার করেন; এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশত বিচার করেন, তিনিও জাহান্নামে যাবেন।”

[সুনান ইবনে মাজাহ, ২৩১৫; সুনান আবু দাউদ, ৩৫৭৩; তিরমিজি, ১৩২২; মান: সহীহ]

ইবনে আবদুল বার তার “আত তামহীদে” এ ব্যাপারে ইজমার বর্ণনা করেছেন যে, এগুলো হচ্ছে কবীরা গুনাহের উদাহরণ। আর এটি উমাইয়্যাহ ও আব্বাসীয়দের সময় হয়েছিলো।

ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর একটি উক্তির কারণে অনেকেই সঠিকভাবে ব্যাপারটি বুঝতে ভুল করেন। উক্তিটি এরকম:

عن طاؤس عن عباس فى قوله "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " قال ليس بالكفر الذى تذهبون إليه ، رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة و قال - صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر ابن كثير

“ত্বাউস (رَحِمَهُ اللَّهُ) ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির’ এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন যে, আয়াতে উল্লিখিত কুফর বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয়। এ

বর্ণনাটি হাকিমও উদ্ধৃত করেছেন তার মুসতাদরাক গ্রন্থে, সুফিয়ান বিন উইয়ায়নার বরাতে এবং বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।”
[ইবনে কাসীর সূরা আল বাকারা - ৮৫/৮৬]

এই আছারের উপর ভিত্তি করে তথাকথিত সালাফি আলিমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ আইন-বিধান ব্যতীত শাসন ও বিচার ফায়সালার শুধুমাত্র পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন,

(১) যে মানব রচিত আইন-বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির।

(২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার আইন-বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন-বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করে এবং মানবরচিত আইন বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির।

(৪) যে ব্যক্তি মানবরচিত আইন বিধানকেই আল্লাহর আইন-বিধান বলে দাবী করবে সেও প্রকৃত কাফির।

(৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আইন-বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানবরচিত আইন-বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না।
[আল-উরওয়াতুল উছক্বা, ১৬৭-১৬৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত ভাগ অনুযায়ী প্রথম চারটির সাথে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসনকে মনে মনে বৈধ মনে করা। তারা বড় কুফরীকে শুধুমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু অন্তরে বৈধ মনে না করলে, মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসনকে তারা ৫ম ভাগে অর্থাৎ ‘কুফর দুনা কুফর’ মনে করেন। কিন্তু তারা এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর অন্যান্য ক্বউল কিংবা অন্যান্য সালাফদের ক্বউল খিয়াল রাখতে ভুলে যান।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর অপর একটি উক্তি হচ্ছে:

أخرج وكيع في أخبار القضاة
(১/৪১):
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :" سئل ابن عباس عن قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: كفى به كفره ".
وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ وكيع: الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وهو ابن الجعد العبدي. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات ١/৫১৫] ، انظر تهذيب التهذيب]
وقال الحافظ في التقريب (١/৫০৫) : "صدوق " .

"ইমাম ওয়াকি (رَحِمَهُ اللَّهُ), আখবারুল কুদা (১/৪১) এ বলেন: আল হাসান বিন আবি রাবি'ঈ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবদুর রাজ্জাক মু'য়ামার হতে, তিনি ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কে, 'যে ব্যক্তি

আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির', এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : এটা 'যথেষ্ট কুফর'।"

***Note:*** ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) পর্যন্ত এই সনদটি সহীহ। এর সকল ব্যক্তিই (বুখারী-মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভূক্ত) সহীহ, শুধুমাত্র ওয়াকি এর শায়খ, আল হাসান বিন আবি রাবি'ঈ ব্যতীত। আর তিনি হলেন ইবনু আল জায়দ আল আবদি। ইবনু আবি হাতিম বলেন, আমি আমার পিতার সাথে তার কাছ থেকে শুনেছি তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে আল সিকাহতে উল্লেখ করেছেন। [তাহজীব আত-তাহজীব : ১/৫১৫] হাফিজ ইবনু হাজার (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। [আত-তাক্বরীব ১/৫০৫]

ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর, 'এটা যথেষ্ট কুফর' কথা থেকে বুঝা যায় এ কাজ বড় কুফরী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর দুইটি ক্বওল পেলাম। একটা আরেকটার সাথে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক।

তাহলে স্বভাবতই এই আয়াতের ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবা (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ) এর ক্বওল অগ্রাধিকার পাবে।

আর এই আয়াতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত আছে :

عن مسروق قال: " كنت جالساً عند عبدالله ( يعني ابن مسعود ) فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} "
وأخرج أبويعلى في مسنده (٥٢٦٦)
ووكيع في أخبار (١٠/١٣٩) وأخرجه البيهقي-
وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب ، (١/٥٢)القضاة
ونسبه لمسدد ، ونقل الشيخ حبيب الرحمن (٢/٢٥٠) العالية
الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية قول البوصيري : "
رواه مسدد وأبويعلى والطبراني موقوفاً بإسناد صحيح
والحاكم وعنه البيهقي ..." .

ইমাম আবু ইয়ালা মাসরুক হতে বর্ণনা করেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর নিকট বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, সুহুত (অবৈধ উপার্জন) কি? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে

‘ঘুষ’। সে বললো, বিচার কাজে? তিনি বললেন, ‘এটা যথেষ্ট কুফরী’।

***<u>Note:</u>*** মুসানাদ আবু ইয়ালা (৫২৬৬), ইমাম বায়হাকী (১০/১৩৯), ইমাম ওয়াকি-এর আখবারুল কুদা (১/৫২), হাফিজ ইবনু হাজার (رَحِمَهُ اللّٰهُ) মাতালিবুল আলিয়া (২/২৫০) তে বর্ণনা করেন এবং মুসাদ্দাদ এর প্রতি সম্পর্কিত করেন। এছাড়াও শাইখ হাবিবুর রাহমান আল-আজামী মাতালিবুল আলিয়া এর টীকায় আল-বুসিরি এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, মুসাদ্দাদ, আবু ইয়ালা ও তাবরানী সহীহ সূত্রে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আল-হাকিম এবং তার থেকে আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছেঃ ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) এর একটি ক্বওলে কুফর দুনা কুফর বলা হলেও, অপর ক্বওলে এটাকে বড় কুফর বলা হচ্ছে। একইভাবে ইবনে মাসউদ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) এর ক্বওলে এটা বড় কুফর হিসেবে এসেছে।

আর অনেকে যেভাবে মনে করেন, শুধু এই আয়াতের অর্থ ‘কুফর দুনা কুফর’ প্রমাণ করতে পারলে তারা

বর্তমান মুরতাদ শাসকদেরকে রক্ষা করতে পারবেন, ব্যাপারটা মোটেও তা না। শুধু এই এক আয়াতের উপর ভিত্তি করে উলামারা এ সকল শাসককে কাফির বলেন না। বরং এই ব্যাপারে অনেক দলীল প্রমাণাদি রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ‘হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ’- এর তিনটি ভাগ রয়েছে :

ক. আইন প্রণয়ন করা : আইন এর মাধ্যমে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা যা ইতিমধ্যে ইসলামী শারীয়াহে নির্ধারিত আছে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর ﷻ অধিকার। যে কেউ এ কাজ করবে, সে নিঃসন্দেহে শিরকে লিপ্ত হবে এবং সে কাফির।

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .-
مجموع الفتاوى

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللّٰهُ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে হারামকে হালাল করে, কিংবা

সর্বসম্মতিমে হালালকে হারাম করে, অথবা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শারীয়াহকে প্রতিস্থাপন করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। [মাজমু আল ফাতাওয়া : ৩/২৬৭]

খ. মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন/বিচার করা: এর দুইটি ভাগ আছে-

১. সর্বদা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা : এটা ইসলামী শারীয়াহ পরিবর্তনের শামিল। এই ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ শাকির (رَحِمَهُ اللّٰهُ) বলেন:

إن في الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لإخفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام ـ كأننا من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه
(عمدة التفسير لأحمد شاكر)

"মানবরচিত আইনের এই ব্যাপারটি সূর্যের আলোর মতো পরিস্কার। এটা পরিস্কার কুফর এবং এর মধ্যে

লুকানো কিছু নেই, যারা ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, তাদের জন্য এ অনুযায়ী কাজ করা অথবা এর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা একে স্বীকার করার কোন অজুহাত নেই, সে যে কেউ হোক না কেন। তাই সবাইকেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য দায়ী থাকবে। তাই আলিমরা পরিস্কারভাবে সত্যকে জানিয়ে দিবেন এবং কোন কিছু গোপন করবেন না, যা বলতে ইসলাম তাদেরকে নির্দেশ দেয়, তা বলে দিবেন।”
[উমদাতুল তাফসীর- মুখতাছার তাফসীর ইবনু কাছীর: ৪/১৭৩-১৭৪]

২. শারীয়াহ আইন অপরিবর্তনীয় রেখে, ব্যক্তি স্বার্থে মাঝে মাঝে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা : এই ব্যক্তি এখনো মুসলিম, ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর প্রথম উক্তি এই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। সৌদি আরবের শারীয়াহ কাউন্সিলের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন :

وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو

كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة (فتَاوى ورَسَائل) -)

আর কুফর দুনা কুফর বলতে বুঝায়, যখন কোন বিচারক যে কোন ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করে এ অবস্থায় যে, সে জানে যে এ কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমটাই এ ক্ষেত্রে সত্য (অধিক কল্যাণকর) এবং এ কাজ তার থেকে একবার কিংবা এরূপ অল্প সংখ্যক বার প্রকাশ পায়। এই ব্যক্তি বড় কুফরী করেনি। আর যারাই আইন প্রণয়ন করে, অন্যদেরকে তা মানতে বাধ্য করে, সেটা কুফরী যদিও তারা ভুল হয়ে যাওয়ার দাবী করে, যদিও আল্লাহর আইনকেই অধিক সত্য মনে করে, এটা হচ্ছে এমন কুফরী যাতে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।
[আল-ফাতাওয়া : ১২/২৮০]

গ. মানবরচিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা: এদের কেউ কেউ কাফির আর কেউ কেউ মুসলিম যারা ‘কুফর দুনা কুফর’ এ লিপ্ত। যদিও তারা আইন-প্রণয়ন কিংবা বিচার-ফায়সালা করছে না, কিন্তু তারা

কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরের নিকটবর্তী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন :

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।" [সুরা-আন-নিসা : ৭৬]

<u>আল্লাহ'র ﷻ নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে</u> আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন: "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফির।" [আল-মায়িদা: ৪৪]

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর শারীয়াহকে পরিবর্তনকারী কোনো বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

"আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়"-

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালাকারীই তাগুত।”

[মাজমু’উল ফাতওয়া: ৭০১/৭৮ পৃষ্ঠা]

ইবনু কাইয়্যিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তার রাসুলকে ﷺ বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায়।”

[ই’লামু মুকিঈন, ৪০/১পৃষ্ঠা]

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“আল্লাহ ﷻ এবং তার রাসুলের ﷺ পরিপন্থী সব জাহিলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল।”

[মাজমুআতুত তাওহীদ ১৭৩/১পৃষ্ঠা]

পুর্ববর্তী শ্রেনীর তাগুতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে আইন-বিধান দান হচ্ছে রব

হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে কেউই তার শরীক নেই, হতে পারে না। কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন। অথচ বর্তমানে এমন অনেক বিচারক আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ কারণে তারা তাগুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যারা এ শ্রেনীর তাগুত-সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেনীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে বিচার-ফায়সালা করে। সমাজে যখন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন মানুষ এদেরকে জড়ো করে এদের কাছে ফায়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের মনমত বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে হাত কাটা। কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয়-চোরকে এতটা জুতার বাড়ি, এত টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা গলায় দিয়ে হাটানো, পায়ে আক দেয়া, নাকে খত দেয়া ইত্যাদি। আবার যিনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে-যিনাকারী অবিবাহিত হলে একশ দোররা (চাবুক) মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত মাটিতে

পুতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল মুমিন সেটা প্রত্যক্ষ করা। অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার চায় তখন এরা বিধান দেয়- যিনাকারীর এত হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ বহির্ভূত করা অথবা ছেলে-মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। এরূপভাবে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিয়ে এরা তাগুতে পরিণত হয়েছে আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব রূপে গ্রহন করছে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

اَمۡ لَهُمۡ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوۡا لَهُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَمۡ یَاۡذَنۡۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَ لَوۡ لَا كَلِمَۃُ الۡفَصۡلِ لَقُضِیَ بَیۡنَهُمۡ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِیۡنَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। [সূরা,শূরা-৪২:২১]

## মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার**:** ছোট কুফর না বড় কুফর***?***

মূল লেখক: শাইখ আবু হামজা আল-মিশরী (فَكَّ اللَّهُ أَسْرَهُ)

আল্লাহ ﷻ তাদের সহায় হোন, যারা ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কথাকে প্রতিহত করছেন এবং যারা ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর সঠিক উক্তিটি বোঝার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন, যারা দুষ্টচক্রের দ্বারা এই কথার ভুল অর্থের মাধ্যমে বিপথগামী হয়েছেন, যারা শারীয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দাবি করছেন।

ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কথার শাব্দিক অর্থ কী?
এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন?
আমাদের প্রথমেই এই বিষয়টি চিন্তা করা উচিত,
‘ইবন আব্বাস **(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)** এর কথা কি ছিল**?’**
এটা বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, সেই সময়ের

প্রেক্ষাপট, যখন তা বলা হয়েছিল। সেই যুগ যখন হযরত মুয়াবিয়া এবং আলী ইবন আবু তালিব (رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُمَا) এর মধ্যে মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়েছিল।

সে সময় আলী (رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ) এর শিবিরের কিছু লোক যারা পরবর্তীতে খাওয়ারিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তারা আলী, মুয়াবিয়া এবং তাদের দুই প্রতিনিধি এই চার সাহাবাকে (رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُم) কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের দাবীর সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে। সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
(المائدة: ٤٤)

“এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই কাফির।”

এর ভিত্তিতে খাওয়ারিজরা ঘোষণা দেয় যে, সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে শারীয়াহ বাস্তবায়িত হয়নি, কাজেই যারা এটা বাস্তবায়নে ব্যর্থ, তারাই কাফির।

এর প্রতি উত্তরে এবং আলী ইবনে আবু তালিব (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর পক্ষাবলম্বনের জন্য ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এই উক্তি করেছিলেন যে, যা ঘটেছিল তা 'কুফর দুনা কুফর' এবং উল্লিখিত চার জন সাহাবা ইসলাম থেকে খারিজ হননি।

ঐ আয়াতের ব্যাপারে খাওয়ারিজদের বুঝটা ছিল ভুল। ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) জানতেন না যে, এই সাদামাটা একটি কথা থেকে আজকের অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থকগণ এটাকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে আর যারা শয়তানদের (ত্বাগুতদের) উৎখাত করে তাদের মুকুট চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করে- তাদের পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে।

এই গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর উক্তিটি সঠিকভাবে তুলে ধরা হবে এবং সেই পরিস্থিতিকে সামনে আনা হবে। এভাবে সেইসব মানুষের কাছে বিষয়টি খোলাসা করা হবে যারা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ, বিভ্রান্ত এবং যারা এই যুগেও আল্লাহর শত্রুদের

উৎখাতের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ গাফিল। এবার আমরা আমাদের এই বক্তব্যের দলীলের দিকে অগ্রসর হব।

## শারীয়াহর 'হুকুম'-এর সাথে 'ফাতওয়া' ও 'রায়'-এর পার্থক্য

الفارق بين الحكم الشر عي والفتوى والقضاء

এই নাজুক পরিস্থিতিতে, আমরা কি ব্যাপারে কথা বলছি তা নিশ্চিত হতে হবে। যে কোন পরিস্থিতি বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, শারীয়াহর হুকুম, ফাতওয়া এবং রায় কি? এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার পরই কেবলমাত্র আমরা এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি।

আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে, শারীয়াহর হুকুম। শারীয়াহ হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম বা বিধান। আর ফাতওয়া হচ্ছে একটি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কোন সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ, যার প্রেক্ষাপটের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ 'সকল প্রকার মাদক হারাম' এই হুকুমটি আমরা পানি বা সিরকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তা সঠিক ফাতওয়া হবে না।

কারণ এগুলোর উপাদান হালাল। এই ফাতওয়া তখনই সঠিক হবে যখন বাস্তবতা এবং শারীয়াহর হুকুম হবে সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ।

রায় বা সিদ্ধান্ত ফাতওয়ার চেয়ে আরও বেশী স্পর্শকাতর। বিধান এটা নিশ্চিত করে যে, শারীয়াহর সঠিক হুকুম সঠিক বাস্তবতায় সুস্পষ্ট এবং পরিস্থিতিটি সত্যিকার অর্থেই সংঘটিত হয়েছে এবং বিচারের সম্মুখীন হয়েছে। সঠিক রায়ের অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই হচ্ছে একজন বিচারকের কাজ। স্পষ্ট একটি বাস্তবতায় নির্দিষ্ট শারীয়াহর স্থান সর্বাগ্রে এরপর ফাতওয়া, সর্বশেষ ধাপ হল রায় বা ক্বদা।

সাহাবী ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কথা প্রারম্ভে আনার কারণ হচ্ছে যে, তার কুরআনের আয়াত মুখস্থ ছিল। তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞান ছিল। তিনি তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বলেছিলেন 'কুফর দুনা কুফর' পরবর্তীতে এই বিখ্যাত উক্তিকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন অবস্থা এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

‘কুফর দুনা কুফর’ উক্তিটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত উক্তি এবং তার অর্থ যা বিভিন্ন মুফাসসিরীন ও হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ শাইখদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত উক্তিটি হচ্ছে, “যে কুফর সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করছো, এটা আসলে সেই কুফর নয়।” এ থেকে বুঝা যায় যে এই উক্তিটি করা হয়েছিল কথোপকথনের মাঝে এই কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ও তার সময়ের খাওয়ারিজদের সাথে।

কাজেই খাওয়ারিজদের মনে যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এই রায় দিয়েছিলেন। এটা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য এবং ঐ সময়ের জন্য। এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি এটাকে কুফর বলেছেন। সেই সাথে তিনি ঐ সময়ের বাস্তবতা এবং ঐ সময়ের নেতাদের অবস্থা বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐসব লোকদের সন্দেহের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি শারীয়াহর হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন (এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া যে বিচার ফয়সালা করে

সে কাফির), কিন্তু বাস্তবতা সেই ধরনের কুফরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

তার সময়ের বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ খেয়াল রাখতে হবে:

১. ঐ সব লোকদের নেতারা যাকে কাফির বলেছিল, তিনি জান্নাতি যা রাসূল ﷺ এর দ্বারা স্বীকৃত, অর্থাৎ আলী (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)।

২. মুয়াবিয়া (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) যাকে খালিফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল নবী ﷺ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলাহি বাণী কুরআনের পাণ্ডুলিপি লেখা।

৩. উভয় পক্ষের মধ্যেই শত্রুতা ছিল এবং একই সময়ে তাদের জ্ঞান ছিল ঐ সময়ের মুর্খ খাওয়ারিজদের থেকে বেশি। তথাপি তারা একে অপরকে ‘কাফির’ বলে আখ্যায়িত করেননি।

৪. শারীয়াহ ১০০% অক্ষুণ্ন ছিল এবং তার প্রয়োগও ছিল।

কাজেই আল্লাহ ﷻ আইন ছাড়া অন্য কোন আইন প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী। এবং সেটা তার অজ্ঞতা অথবা দুর্নীতির ফসল যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কাজেই, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর উক্তির পিছনে বাস্তবতা ছিল এবং তা তিনি তার সময়ে ফাতওয়া হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন। যারা আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তাদের ব্যাপারে ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আরেকটি উক্তি করেছিলেন যা 'আম' অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই উক্তিটি নিম্নোরূপঃ

حدثنا عن حشن ابن أبي الر بيع الجر جاني قال أخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عناس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل االله فأو لئك هم الكافرون قال : كفى به كفره

"হাসান ইবন আবি আর রাবিয়া আল-জুরজানি থেকে বর্ণিত, আমরা আবদুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মুয়ামার থেকে, তিনি ইবন তাউস থেকে এবং তিনি তার পিতা

থেকে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কে আল্লাহ'র এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" তিনি বলেছিলেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।"

[আকবারুল কাদ্দাহ, ভলিউম- ১, পৃষ্ঠা ৪০-৪৫, লিখক, ইমাম ওয়াকিয়া।]

যখন ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এই উক্তি করেছেন যে, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট" তখন এটাকে ছোট কুফর হিসেবে গণ্য করা যাবে না। যখন তিনি বলেছেন 'যথেষ্ট', তখন এটাকে শুধু বড় কুফর হিসেবেই ধরতে হবে। কুরআনের আয়াতের তাফসিরের নিয়মাবলী অনুযায়ী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা ছয়টি পয়েন্ট নিয়ে গঠিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলঃ

১. আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সকল মাজহাব এবং ফুক্বাহা (ইসলামী আইনজ্ঞ) এই ঐক্যমত পৌঁছেছেন যে, কোন এক সাহাবীর বা কিছু সাহাবীর

বক্তব্যই কুরআনের সাধারণ আয়াতকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এই নিয়মকে বলা হয়ঃ

لا يصلح مخصصا للقرآن

যার অর্থ হচ্ছে কুরআনের একটি আয়াত যার ক্ষেত্র হচ্ছে ‘আম’ (সাধারণ) তাকে একজন সাহাবীর বক্তব্যের দ্বারা খাস (বিশেষ) ভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যাপারে ইজমা, কুরআনের বিপরীত আয়াত, হাদীস অথবা অন্য কোন দলিল থাকে।

এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কর্তৃক বর্ণিত ‘কুফর দুনা কুফর’ ঐ ব্যাপারে ভুল ছিল কিংবা ঐ সময়ে তার দেওয়া ফাতওয়া ভুল ছিল। না, এ ধারণা ঠিক নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, তিনি এবং সাহাবীগণ ঐ সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফাতওয়া’র অর্থ বুঝেছিলেন, যা কুরআন অথবা সুন্নাহর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. কুরআন সংরক্ষণের জন্যই আমাদের আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের ইজমার ভিত্তিতে তাফসীরের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ম হচ্ছে যে, কুরআনের আয়াতের বর্ণনা অবশ্যই বাহ্যিক অর্থের সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যতক্ষণ না অন্য কোন দলিল থাকে যে, আমরা এটাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারব। এটা খুবই কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

তাফসীর বিশারদগণ বলেন, "যদি এই নিয়ম সংরক্ষিত না হয়, তবে বাতিন লোকদের জন্য বিদআতের দরজা খুলে যাবে। তারা কুরআনের ভিন্ন অর্থ নিবে এবং আহলুস সুন্নাহর ঐক্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ তারা উপস্থাপন করবে।" এটা বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল শব্দ অথবা আয়াতের প্রতীয়মান অর্থ নিয়েই ভাবা উচিত নয়। যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, তবে এটা প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন।

***Note:*** [বাতিন লোক হচ্ছে তারা যারা বলে যে কুরআনের বাহ্যিক অর্থ স্পষ্ট নয়, বরং আরো গোপনীয় এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। এটা যারা করে তারা হচ্ছে সুফিয়ান, শিয়া এবং বাতিনিয়া।]

উদাহরণস্বরূপ ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের অর্থে এক প্রকারের কুফর বুঝেছিলেন যা তিনি একটি কুফর হিসেবে আখ্যায়িত

করেছিলেন। কিন্তু তিনি কুফর শব্দটি পরিবর্তন করেননি। তিনি জানতেন যে, নবী ﷺ কর্তৃক হাদিসে বর্ণিত আছে:

“তিন প্রকারের বিচারক আছে, যাদের দু’প্রকার জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকার জান্নাতে যাবে। জান্নাতি সেই যে সত্য জানে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে। এমন বিচারক যে তার মূর্খতা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে সত্য জানে কিন্তু সত্য থেকে বিমুখ, সেও জাহান্নামে যাবে।”
[সুনান আবু দাউদ, ৩৫৭৩; সুনান তিরমিজি, ১৩২২; সুনান ইবনু মাজাহ, ২৩১৫, মান: সহীহ]

এই স্বতন্ত্র দলিল যা ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ) কে আলী ও মুয়াবিয়া (رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا) সম্পর্কে তাকফির করা থেকে বিরত রেখেছে। এর কারণ হচ্ছে, খাওয়ারিজরা আয়াতটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছিল, হাদিসের ভাষ্যে বিচারক ঐ সময়ে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখি, খাওয়ারিজরা নিজস্ব কারণে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, পক্ষান্তরে মুজাহিদদের অবস্থান

ছিল শারীয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে।

৩. ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) শারীয়াহর পরিবর্তনকারী লোকদেরকে কুফফার বলেননি, বরং এটা ঐ সব লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা ইলাহি বিধান বা আইন ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে, এটিও বড় কুফর কিন্তু শারীয়াহর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার মতো কুফরের চেয়ে ছোট।

৪. আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর অনেক ব্যাপারেই সাহাবাদের থেকে ভিন্ন ছিল, যেমন: প্রথমে তিনি নিক্কাহ আল মুতাহ (অস্থায়ী বিবাহ) কে হারাম মনে করতেন না, বরং এটাকে হালাল হিসেবে গণ্য করতেন, যতক্ষণ না আলী ইবনু আবু তালিব (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) তাকে বলেছিলেন, "তুমি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ"। ইবনু জুবাইর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) মন্তব্য করেন, "যদি তুমি এটাকে হালাল বলতে থাকো, তবে আমি তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করব।" ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এই ফাতওয়া ও দিয়েছিলেন যে, রিবা আন-নাসিয়া (পুঞ্জীভূত সুদ) হালাল, কিন্তু সব মিলিয়ে পরম্পরায় সুদ হারাম। তিনি এ

ফাতওয়াও দিয়েছিলেন যে, ঈদে কুরবানী ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) যখন বেশির ভাগ সাহাবীগণ এটাকে মুস্তাহাব বলতেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে সে দেখতে পাবে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) অন্য অনেক বিষয়ে সাহাবীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাহলে কেন 'কুফর দুনা কুফর'-এর অন্ধ অনুসারীরা তার অন্যান্য নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ করে না**?**

৫. পূর্বেকার মুফাসসিরগণ যেমন: ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ), ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) এবং ইবনু কাইয়্যিম আল জাওজিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) এবং আধুনিক তাফসীর বিশারদগণ যেমন: আহমাদ শাকির (رَحِمَهُ اللَّهُ), মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন এবং তারা ঐ সময়ের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি জানতেন।

তাহলে কেন তারা এ বিষয়ে তার থেকে দ্বিমত পোষণ করছেন এবং তাদের যুগের শারীয়াহ পরিবর্তন করার জন্য কিছু শাসককে কাফির বলেছেন?

এই মুফাসসিরগণ ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর মতামত ব্যক্ত করেননি। তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন না, যতক্ষণ না তারা বক্তব্য ও পরিস্থিতি পুরোপুরি জানতে পারেন। অথচ তাদের কেন খাওয়ারিজ বলা হচ্ছে না?

যখন ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর সাথে কতিপয় সাহাবাগণের ভেড়া কুরবানীর বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তিনি তখন কুরআনের থেকে আয়াত উল্লেখ করেন এবং হাদিস পেশ করেন। অন্যান্য সাহাবীগণ বললেন, “আবু বকর ও উমার কখনও এরূপ বলেন নাই অথবা এটাকে ওয়াজিব বলতেন না।” তখন তিনি তার বিখ্যাত মন্তব্য করেন, “আমি আল্লাহ ﷻ ও রাসূল ﷺ -এর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ও উমামরের কথা বলছো। তোমরা কি ভীত নও যে, আল্লাহর গজব আকাশ থেকে তোমাদের মাথায় এসে পড়বে।”
[ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১/৩৩৭; ইবনু কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওক্কি'ইন, ২/৩৬১; আল-খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফাকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ, ১/৪৩২]

কুরআনের হুকুম অনুসরণে যিনি এতো কঠোর, আজ তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধে; এমন পরিস্থিতিতে তিনি কি খুশী থাকতেন? কখনও নয়!

৬. আমাদের বোঝা উচিত ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর অন্য আরেকটি বক্তব্যকে, "এটা আল্লাহ ও তার মালাইকাদের সাথে কুফর করার মতো নয়।" তার এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে, এটা বড় কুফর হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ ও তার মালাইকাদের সাথে কুফরীর মতো নয়, কারণ আল্লাহর ﷻ সাথে অংশীদার স্থাপন করলে একজন কাফির হয়ে যায়। তাদের এই কুফর ঐ কুফর থেকে ভিন্ন যেখানে আল্লাহ ও তার মালাইকাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।

বড় কুফর আমরা তখনই বলতে পারি যখন এটা আল্লাহর অধিকারের সীমা অতিক্রম করে, যেমন বিধান, আনুগত্য অথবা ভালবাসা। যদি এটা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে এটা ছোট কুফর।

পরিশেষে, ইবনু আব্বাসের (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বক্তব্যকে সেই জালিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, যারা শারীয়াহ পরিবর্তন করে। তাদের জন্য তরবারির আয়াত ব্যবহার করা উচিত, যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ৫]

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত,

أن نضرب بهذا (وأشار إلللى السيف) من أمرنا رسول االله خرج عن هذا (وأشار ألى المصحف)

“রসূল ﷺ আমাদেরকে এটা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন (তিনি তরবারিকে ইঙ্গিত করলেন) যারা এটা থেকে আলাদা (তিনি কুরআনের দিকে ইঙ্গিত করলেন)।”
[মাজমু’উ আল-ফাতাওয়া, খন্ডে: ৩৫]

এ কথার অর্থ পুরোপুরিভাবে তাই যা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ঘোষণা করেছে, যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদে অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা হয়; আর এ ঘোষণা হল- শারীয়াহ বা বিধানের কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে বড় কুফর। যদি তারা শারীযাহর বাস্তবিক প্রয়োগ করতে কিছু ব্যর্থ হয়, তবে এটাকে ধরা যেতে পারে ছোট কুফর। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ বিচার বিষয়ক প্রাপ্য সমস্ত আয়াত ব্যবহার করেছে, যেখানে বিদআতী লোকেরা শুধু সেই আয়াত ব্যবহার করেছে যা তাদের জন্য খাপ খায়। এই ব্যাপারে একমত হলে কেউই বিধানের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) অথবা অন্য কারো বক্তব্য পাবেন না যেখানে বলা হয় “এটি শির্ক, তবে ছোট শির্ক”।

আমরা খুবই আশ্চর্য হই যে, যারা নিজেদেরকে ‘সালাফ’ দাবী করে এবং ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর ‘কুফর দুনা কুফর’ ব্যবহার করে, আর সবকিছুকে দোষারোপ করলেও তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদে বিচার ফয়সালা করাকে দোষারোপ করে না।

৭. ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -এর বক্তব্য সত্যায়ন করতে ইবনু মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ও তাই বলেছেন, যা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনু কাসিরে এসেছে। যখন তাকে (ইবন মাসঊদ) রিসা (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, “এটা হচ্ছে সুহত (অবৈধ সম্পদ)”। তখন আবারও জিজ্ঞেস করা হয়, “না, আমরা বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে বলছি।” তিনি উত্তর দেন,

“ذاك اكفر“

“এটা হচ্ছে কুফর।”

তাফসীর ইবনে কাসির এবং আকবার আল-ক্বাদায় এর উল্লেখ আছে। কেন ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেননি এবং তিনি নিজের

মন্তব্য বাদে সাহাবা এবং অন্যান্যদের মন্তব্য এনেছেন? আসল ব্যাপার হল, যে দিকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না তা হচ্ছে, ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) একজন জ্ঞানী ফকীহ ছিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাস্তবতার কারণেই সাহাবাগণের উদ্ধৃতির পর তারা তাদের মন্তব্য স্থান দিয়েছেন।

ইমাম ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) হুবহু তাই করেছেন। বিচার ফয়সালা বিষয়ক আলোচনা সূরা মায়িদার ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নং আয়াত থেকেই তিনি শুরু করেননি, বরং তিনি ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন ৫০ নং আয়াতে গিয়ে। এগুলোর দশটি আয়াত নিম্নরূপঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

“তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।”

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ
سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ
فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُولَٰٓئِكَ
الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ
فِى الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যারা মুখে বলে, ‘ঈমান এনেছি’ অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না। ইহুদীগণ মিথ্যা শ্রবণে তৎপর এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনও তোমার কাছে আসেনি, এরা সেই অপর সম্প্রদায়টির জন্য নিজেদের কান খাড়া করে রাখে। শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, ‘এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে।’ আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করবার নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।”

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।”

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُولَٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

“তারা তোমার উপর কিরূপ বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর আদেশ আছে? তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়।”

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ

“নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আর বিধান দিত রাব্বানীগণ (রবের সাধকগণ) এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।”

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

“আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ এটা ক্ষমা করলে তা তারই পাপ মোচন করবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।”

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

“মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।”

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

“ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ এতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।”

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَلٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتٰكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারীয়াহ ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা

প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।“

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لِيُوقِنُونَ

“অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা এর কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।”

أَفَحُكْمَ الْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?”

[সূরা মায়িদা: আয়াত ৪০-৫০]

শুধু তখনই ইবন কাসীর (رَحِمَهُ اللّٰهُ) তার সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, যা ছিল তাতারদের সময়ের, যারা চেঙ্গিস খানের বিধানের দ্বারা বিচার ফয়সালা করতো। এই পরিস্থিতি আমাদের সময়েও ঘটছে। তিনি এবং আহমাদ শাকির (رَحِمَهُ اللّٰهُ) যা বলেছিলেন তা সকলেরই জানা।

সাধারণত ফক্বীহগণ কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছানো এবং কোন বিষয়ে তার রায় প্রদানের পূর্বে সে প্রাসঙ্গিক সমস্ত আয়াত এবং ঐ আয়াতের হাদীস উল্লেখ করেন। এরপর অন্যান্য আলিমদের মন্তব্য আনেন। পরিশেষে, সমস্ত দলিল উপস্থাপনের পর ঐ বিষয়ের শেষে তার রায় ব্যক্ত করেন।

এ যাবত ইবন কাসীর (رَحِمَهُ اللَّهُ) -এর রায় সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি একক সমস্যার বিশেষ দিক যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। চলুন এই সম্মানিত শাইখের বক্তব্য অধ্যয়ন করি।

ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) তাদের কিতাবটির ব্যাপারে বলেছেন, যে কিতাব ছিল বিভিন্ন বিধিবিধান সংবলিত এবং যা প্রণয়ন করেছিল চেঙ্গিস খান,

وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في نا قليل ولا كثير

“এটা ছিল বিভিন্ন বিধান সংবলিত একটি সংগৃহীত গ্রন্থ, যা চেঙ্গিস খান বিভিন্ন শারীয়াহ থেকে তথা ইহুদিদের খ্রিষ্টানদের এবং ইসলামী শারীয়াহ থেকে সংগ্রহ করেছিল। এছাড়াও চেঙ্গিস খান এই গ্রন্থের

অসংখ্য বিধান স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করেছে। আর এভাবে এই বিধিবিধান চেঙ্গিসের উত্তরসূরিদের মধ্যে একটি অনুসৃত শারীয়াহতে পরিণত হয়। তারা এই এর শারীয়াহকে আল্লাহর ﷻ কিতাব ও তার রাসূল ﷺ সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিয়েছিল। যে ব্যক্তি এরকম করে সে কাফির এবং তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ﷻ ও তার রাসূলের ﷺ বিধানের দিকে ফিরে আসে। ফলে সে ছোট-বড় কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ ﷻ ও তার রাসূলের ﷺ বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে বিচারক গণ্য করবে না।"

[তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৮৮; সূরা মাইদাহ'র ৫০ নং আয়াত]

ইবনু কাসির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) তাতারদের কিতাব আল-ইয়াসাকের মধ্যে যে বিধান আছে তার ব্যাপারে:

وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"

“এর মধ্যকার যাবতীয় বিধান আল্লাহ ﷻ কর্তৃক তার (নির্বাচিত) বান্দা নাবীগণের عليهم السلام ওপর নাজিলকৃত শারীয়াহর বিরোধী। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর ﷺ প্রতি নাজিলকৃত সুস্পষ্ট শারীয়াহ পরিত্যাগ করবে এবং অন্যান্য মানসূখ (রহিত) শারীয়াহর কাছে বিচারপ্রার্থী হবে, সে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইয়াসাক্ব কিতাবের কাছে বিচারপ্রার্থী হয় এবং তাকে ইসলামী শারীয়াহর ওপর প্রাধান্য দেয় তার অবস্থা কেমন হবে? যে ব্যক্তি এই কাজ করবে সে মুসলিমদের ঐক্যমতে কাফির হয়ে যাবে।”

[আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড: ১৩; পৃষ্ঠা: ১২৮; ৬২৪ হিজরীর ঘটনাবলি।]

এই শতাব্দী এবং বিগত শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) -এর বক্তব্যকে এই অংশে আনলে আরও জোড়ালো হবে। মিশরের এই বিখ্যাত কাদ্বী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল,

“এটা কি আল্লাহর শারীয়াহর বৈধ যে মুসলিমদের ভূমিতে মুসলিমদের বিচার করবেন পাদ্রী, ইউরোপের ধর্ম যাজকদের বিধান দ্বারা? যেখানে তাদের, এই বিধান এসেছে মিথ্যা এবং সংমিশ্রিত মতামত হতে। তারা তাদের বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং তাদের নফসের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ প্রতিস্থাপন করেছে।

না, এই বিদআতের উদ্ভাবক শারীয়াহ বা এর লঙ্ঘন থেকে বেখবর। মুসলিমদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি, শুধু তাতারদের সময় ছাড়া এবং তা ছিল খুবই খারাপ সময়। সে সময়ে অনেক হানাহানি ও জুলুম হয়েছিল এবং তখন ছিল অন্ধকার যুগ।

কাজেই এই স্বচ্ছ বিদআতী বিধান, যা সূর্যের মতো স্পষ্ট তা হল, আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।”

[হুকুম ইল জাহিলিয়াহ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা, এবং উমদাহ তাফসীর। আয়াত ৫০, সূরা আল-মায়িদা।]

এই ক্ষেত্রে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এর বক্তব্যকে আনা যায়। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) -এর চাচাতো ভাই এবং আরবের প্রখ্যাত মুফতি। শারীয়াহ পরিবর্তন করার বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছে:

“আসল কথা বলতে, কুফর দুনা কুফর হচ্ছে যখন বিচারক আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার ফয়সালা করে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে, এটা কুফরী। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন এক কারণে সে তা পরিত্যাগ করেছে। এরই পরম্পরায় যে আইন তৈরি করবে এবং অন্যদেরকে এটার অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, তখন এটা কুফর হবে। যদিও সে একথা বলে, ‘আমরা গুনাহ করছি এবং নাজিলকৃত বিধানের বিচার ফয়সালা বেশি উত্তম।’ তা সত্ত্বেও এটা কুফর যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।”

[মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আলুশ শাইখ এর ফাতওয়া, খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৮০]

শারীয়াহ পরিবর্তন করার বিষয়ে ঐ শাইখ অন্যত্র আরও বক্তব্য পেশ করেছেন:

“আর এটি (শারীয়াহ পরিবর্তনের কুফর) অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী ভয়াবহ; এটি শারীয়াহর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঔদ্ধত্য। আর এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় যখন তারা আল্লাহর ﷻ এবং তার রাসূলকে ﷺ উপেক্ষা করে, শারীয়াহ কোর্টের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে নতুন কোর্ট স্থাপন করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিকৃতির নানা প্রয়াসের অংশ হিসেবে বহু জিনিসের জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে বাতিলের ভিত্তি দাঁড় করায় ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে; বিচার ফয়সালা দেয়, ফয়সালা মানতে মানুষকে বাধ্য করে এবং বাতিলের হাতে বিচারের দায়িত্ব তুলে দেয়।

শারীয়াহ কোর্ট যেখানে বিধান দেওয়ার জন্য আল্লাহর ﷻ কিতাব এবং নবীর সুন্নাহর ﷺ প্রতি মনোনিবেশ করে সেখানে বর্তমানে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আইনসমূহ বিবিধ মিথ্যা ও প্রবঞ্চক শারীয়াহ থেকে গৃহীত আইন দিয়ে তৈরি হয়। এটা কয়েকটি আইন পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরি যাতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ (ফরাসি) আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইন

এবং অন্যান্য আইন। প্রচলিত এই শারীয়াহ আরও রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষের চিন্তাধারা, এর মাঝে কিছু হল বিদআত আর বাদবাকি শারীয়াহ বহির্ভূত বিষয়। এই ধরনের অনেক কোর্টই এখন ইসলামী শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

যেগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলোর দরজা উন্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করছে যা কিনা কিতাব এবং সুন্নাহর থেকে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা শারীয়াহর বিচার তাদেরকে মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর শারীয়াহর উপর প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়। তাহলে আর কোন কুফর এই কুফর থেকে বেশি বিস্তৃত এবং স্বচ্ছ হবে? এটা মুহাম্মদ ﷺ যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশী।”

[এটা শুধু ফাতওয়াই নয় বরং শাইখের পক্ষ হতে ওসিয়াত (শেষ উপদেশ এবং ইচ্ছা)। এটা তার জীবনের শেষ বই যা ১৩৮৯ হিজরীতে (১৯৬৯ সাল) ৭৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর একজন বড় আলিমের প্রচন্ড আক্রমণ তাগুত-ব্যবস্থার প্রতি।]

৮. ফক্বীহগণ শুধু কুরআন ব্যতীত অন্য আইনে শাসনকারীদেরই কাফির ঘোষণা দেননি, উপরন্তু তাদের আলিমদেরও কাফির বলেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" [সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللّٰهُ) বলেন,

"যদি কোন শাইখ কুরআন এবং সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন

বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের ﷺ শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন মুরতাদ এবং কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়াতে ও আখিরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।"

[আল ফাতওয়া, ইবন তাইমিয়্যাহ খন্ড-৩৫, পৃষ্ঠা-৩৭৩।]

৯. ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ৮০ বছর বয়সে মারা যান। ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আল-হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ আছ-ছাকাফী এর সমসাময়িক। কাজেই আমরা সহজেই তা বর্ণনা করতে পারি। এখন যদি আল-হাজ্জাজ আমাদের সময়ে থাকতেন তবে তার বিরোধিতা না করা মোটেও সমীচীন হবে না, কারণ শারীয়াহর পূর্ণ বাস্তবায়ন করেই সে ছিল একজন মুসলিম। তিনি (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করতেন এবং উম্মাহকে অনেক সুবিধা ও সম্পদ এনে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ হচ্ছে মিশ্র শারীয়াহ নয় বরং তার নিজের ক্ষমতার জন্য তিনি মুসলিম এবং কাফিরদের হত্যা করতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকরা তাদের নিজেদের মিশ্র, ভ্রান্ত মানব রচিত আইনের জন্য মানুষ হত্যা করে।

১০. ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আল-হুসাইনকে শক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন ইরাক থেকে আগত বনী উমাইয়াদের সাথে যুদ্ধ না করার জন্য। আল-হুসাইনের প্রতি তার উপদেশ ছিল যদি বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চাইতো তবে তা ইয়েমেন থেকে আগতদের সাথেও তাই করতে হতো, ইরাক থেকে আগতদের সাথে নয়, যা ইতিহাসের অনেক বইতে বর্ণিত আছে। তথাপি আল-হুসাইনকে তিনি বলেননি যে, সে একজন খাওয়ারিজ যদি সে বনী উমাইয়া অথবা আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত।

এখন অন্য আরেকটি বিষয় অবশ্যই আলোচনা করতে হবে যা আমরা ফাতওয়া, হুকুম শারীয়াহ এবং বিধানের পার্থক্যের পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের অবশ্যই বিধান এবং বিচার-ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান অনেক বিস্তৃত। বিচার ফয়সালা বিধানেরই একটি অংশ। এ কারণেই কোন বিচারক যদি আল্লাহর শারীয়াহর দ্বারা বিচার-ফয়সালা না করে, তখন বিধানের অন্য ধারার

প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে সে কি মুসলিম না কাফির? বিধান হচ্ছে আইন বিচার-ফয়সালা এবং নির্দেশের বাস্তবায়নের সমন্বয়।

যদি সাময়িকভাবে শারীয়াহ বাদ দিয়ে সে বিচার-ফয়সালা করে, তখনও আল্লাহর বিধানই বলবৎ থাকে, তবে সেটা এক ধরনের কুফর, তবে ছোট কুফর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বিধান অক্ষত থাকে, তখন শারীয়াহর আইনের বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে কুফর দুনা কুফর। যদি বিধান পরিবর্তন হয়, তবে সেটা হবে বড় কুফর। ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয়। এটা ঐ সময়ে খাওয়ারিজদের মনে ছিল না।

১১. ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -এর সময়ের একটি ঘটনা বলা হচ্ছে যেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি, শুধুমাত্র একবার ঘটেছিল। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা এমন একজনের কথা বলছি যে কিনা আল্লাহর শারীয়াহর পরিবর্তে অন্য শারীয়াহ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে, শারীয়াহর পরিবর্তন করে

আইন তৈরী করে এবং এমন আইন করে যাতে জালিম শাসকদের সংশোধনের জন্য যারা চেষ্টা চালায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়। এ কারণেই সাহাবাদের সময়ের আলিমরা বলতেন এটা কোন ইস্যু নয়। কারণ কারো অন্তরেই এটা ছিল না যে, কেউ গোটা শারীয়াহ পরিবর্তন করবে।

১২. মানব রচিত সবকটি আইনই 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র প্রেক্ষিতে সরাসরি নেতিবাচক যা তাওহীদের একটি অংশ। মানবরচিত আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা হয়, যে ঐ আইন মান্য করে এবং তাকে ভালো নাগরিকের শ্রেণীতে গণ্য করা হয় যদিও সে একজন পাদ্রী হয়। যতক্ষণ না কেউ মানবরচিত বিধানের সাথে সংঘর্ষ করে, ততক্ষণ তাকে ভালো নাগরিকের কাতারে শামিল করা হয়। আর মুমিনগণ – যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, তাদের দোষী, কুলাঙ্গার, জঙ্গীদের কাতারে ফেলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ফাঁসিও দেওয়া হয়। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব যে, ঐ ধরনের নীতির লোকদের বাঁচাতে ইবনু আব্বাসের (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বক্তব্যকে ব্যবহার করা হবে।

## কাফির, জালিম ও ফাসিক বিচারক

এই সকল মতবিরোধের আলোকে, আমাদের জানা খুবই দ্বরুরী যে, বিচার-ফয়সালা ব্যাপারে আমরা কোন ধরনের বিচারক নিয়ে কাজ করছি। শুধু তখনই আমরা সঠিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারব এবং সে অনুযায়ী চলতে পারব। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, এমন কিছু বড় ফিসক এবং বড় জুলম আছে যা একজনকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণ বের করে তাকে কাফিরে পরিণত করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ

“আর যখন আমি মালাইকাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, কেবল ইবলিস ব্যতীত, সে ছিল জ্বিনদের একজন; সে তার রবের আদেশ অমান্য করে ফাসিক হয়ে গেল।” [সূরা আল-কাহাফ, ১৮:৫০]

এই আয়াতে শয়তান যে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল তা সত্যিই একটি ফিসক (অবাধ্যতার গুনাহ) যা

একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কাজেই, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তান কাফির হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে আল্লাহর আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন,

يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় জুলুম।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩]

এই আয়াতে আবারও বলা হয়েছে যে শিরক হচ্ছে বড় জুলুম। কাজেই এটা এমন এক ধরনের জুলুম যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে?

খলিফার অবাধ্য হওয়া অথবা তার বিরুদ্ধে যাওয়া আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াহ’র আক্বীদাহ নয়, যদি না তা খুবই অত্যাবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে অনেক

হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে খলিফার অবাধ্য না হতে, এমনকি সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

“যদি পৃথিবীতে কোন খলিফা থাকে, সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা সত্ত্বেও তার আনুগত্য কর, যদিও গাছের শিকড় চাবাতে চাবাতে তোমার মৃত্যু হয়।”
[আবু দাউদ এবং আহমেদ কর্তৃক সংগৃহীত, হুযাইফা ইবন আল ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত।]

যাহোক, এই হাদিসের প্রেক্ষাপট আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই হাদিস শুধু আপনাকে নির্মম সমালোচনার জন্য প্রযোজ্য, দ্বীনের ক্ষেত্রে নয় এবং এটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকল মুসলিমের সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। হালাল হারামের বিষয় ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য খলিফার বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।

তোমার এবং তোমার গোত্রের ব্যক্তিদের ব্যপারে যদি খলিফা জুলুম করে তবে তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ কর

না বরং ধৈর্য্য ধারণ কর। কিন্তু যদি আল্লাহর ﷻ অধিকার খর্ব করা হয়, তবে তুমি সেই ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) খলিফার বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

যদি আপনার শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তবুও আপনাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, যেমনটি আল্লাহ ﷻ আসহাবুল-উখদুদ এর ঘটনার অধিবাসীদের প্রশংসা করেছেন যাদের কোন শক্তি বা কুওয়াত ছিল না। তারা সকলে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যতক্ষণ না তাদের হত্যা করা হয়। এই সংক্রান্ত হাদিস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ ﷻ এর অধিকার যা তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে দিয়েছেন; সুতরাং শারীয়াহর ব্যাপারে প্রেক্ষাপট ব্যতীত হাদিস ব্যবহার করা উচিত নয়। তথাপি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিপরীত মুখী কাজ করতে আমরা দেখি। এইসব লোকগুলো হচ্ছে তারা যারা বর্তমান এই হাদিস আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে! প্রসঙ্গত, কোথায় সেই খলিফা**?**

আমাদের বলা প্রয়োজন যে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াহ এর কত অসংখ্য ইমাম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়েছে অথচ তাদেরকে কেউই খাওয়ারিজ বলেননি। এটাও জানা যায় যে, এই শাসকরা কুফফারও নয়। আমরা এমন কিছু ইমামের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করব যারা শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধও করেছিলেন।

১. আন-নাফস আয-যাকারিয়া যার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলি ইবনু আবু তালিব যিনি ১৪৫ হিজরীতে মারা যান।

২. মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান। যিনি হাসান ইবনু আলী (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -কে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দেওয়ার ৬ মাস ও ২দিন পর মতপার্থক্যের কারণে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।

৩. সম্ভবতঃ সবার উপরে ইসলামি ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, আল-হুসাইন (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) যিনি ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধাচরণ

করেছিলেন এবং যাকে কারবালার প্রান্তরে শহীদ করা হয়। কেউই একবারের জন্যও হুসাইন (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কে খাওয়ারিজ বলেননি।

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু জুবাইর (رَحِمَهُ اللَّهُ), যিনি আজ-জুবাইর ইবনু আওয়াম (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর পুত্র ছিলেন। তিনি বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং খলিফা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেই সাথে মদীনার আমীরকে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তাকে শহীদ করা হয়েছিল এবং তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

৫. খলিফা হাদি (১৭০ হিজরী) এর সময় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনু আলি ইবনু হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব মক্কা ও হিজাজের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন যিনি ১৬৭ হিজরীতে মারা যান। [তারিখ আত-তাবারি, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১০]

৬. ইমাম আবুল হাসান মূসা কাসিম ইবনু জাকির আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাকির, খলিফা হারুন আর-রশীদ এর বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন

তাকে আটক করা হয়েছিল যতদিন না তিনি মারা যান। তিনি ১৮৩ হিজরীতে মারা যান। [তারিখ আল-ইয়াকুবি, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৫।]

৭. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আস-সাদিক মক্কা ও হিজাজে থাকা অবস্থায় খলিফা মামুনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন।

৮. ইমাম আলি আর-রিদা ইবনু মূসা কাসিম ইবনু জাফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আল-কাসিম, খলিফা মুতাসিম-এর সময় বিদ্রোহ করেছিলেন। তাকে আটক করা হয় এবং পরাভূত করা হয়।

৯. ইব্রাহীম ইবনু মূসা কাসিম ইবনু জাফর আস-সাদিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ইয়েমেনে অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন।

১০. বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) (১১১৬-১২০৬ হিজরী)। যিনি উসমানীয়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে জাযিরার আরবরা মূর্তি পূজা ও অন্যান্য বিদআত পরিত্যাগ করে।

ইতিহাসবিদ অথবা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াহর কোন ইমামগণই এই ধরনের বিদ্রোহকারীদের খাওয়ারিজ বলেননি এবং ঐসব শাসকদের কুফফারও বলেননি। তাহলে মুজাহিদদের ক্ষত্রে কি হলো? তারা সমস্ত দিক থেকেই স্পষ্ট কুফর দেখতে পাচ্ছে। আমরা এই বইতে তাদের বিরুদ্ধে অনেক দলিল ও হাদিস পেশ করেছি। এই দলিলগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সহীহ আর বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যধিক। অধিকন্তু, এই ধরনের শাসকেরা বাস্তবে দখলদার।

কাজেই এটা প্রমাণিত যে, শুধু তারাই নয় যারা শারীয়াহ পরিবর্তন করে এবং যে কেউ আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হবে সেই কুফফার। আসলে শারীয়াহর দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে কুফর। যারা নিজেরা শারীয়াহ উদ্ভাবন করে, তারা কুফরের উপর কুফর করছে। যারা নিজেদের শারীয়াহ শক্তির দ্বারা জনগণের উপর আরোপ করতে চায় তারা সবচেয়ে বড় কুফরের চাইতেও বড় কুফর করছে।

আর যারা এই ধরনের কুফরকে জায়েয করছে তারা সকল কুফরের সবচেয়ে বড় কুফর করছে। এবং তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ﷻ দ্বীনকে বিকৃত করছে। তারা কুফর সম্পর্কে বক্তব্য দেয় এবং এটাকে হালালের আওতায় নিয়ে আসে।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই লোকেরা যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে তাদের নিজেদের শারীয়াহর জন্য তারা এক ধরনের খাওয়ারিজ। পূর্বের খাওয়ারিজ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পূর্বের খাওয়ারিজরা শারীয়াহ রক্ষার জন্য বিদআত করতো আর এই প্রক্রিয়ায় মুসলিমদেরকে আঘাত করতো ও হত্যা করতো। কিন্তু নতুন খাওয়ারিজরা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে এবং তারা শারীয়াহকেও ধ্বংস করছে।

পূর্বের খাওয়ারিজরা সালিহীন হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গোঁড়া ছিল। আর বর্তমান প্রজন্মের খাওয়ারিজরা কমই ইবাদত করে। খাওয়ারিজদের বর্ণনার সাথে বর্তমান প্রজন্মের শাসকদের বিস্তর মিল আছে। কারণ তারা মুসলিমদের

হত্যা করে এবং কাফিরদের ছেড়ে দেয়। যেমন, বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত আছে।

যাহোক, হে আমার ভাই, কল্পনা করুন আপনি সমস্ত দলিল প্রমাণাদি জানেন এবং এমন একটি সময় উপস্থিত যেখানে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -এর বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকরভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বাস্তবে আমরা অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে পাই, একজন সচেতন যুবক ভাই কিভাবে একজন শাইখের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করার মাধ্যমে দালালার (পথভ্রষ্টতার) দিকে পরিচালিত হয়। এই শাইখরা ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কথা অপব্যবহার করে জনগণকে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে চুপ থাকতে এবং তাদের শ্রদ্ধা করতে অনুপ্রাণিত করে। উল্টা তারা জনগণকে উস্কানি দেয় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, যারা এই জালিম শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

<u>শিরক আল হাকিমিয়্যাহ এবং শিরক আত-তাআ:</u>

শাসন/সংবিধান এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেখানে কোন বিষয় শুধু

আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট (যেমন: আল্লাহর আইনের বিপরীতে কারোও আনুগত্য করা)। শাসন বা সংবিধানের ক্ষেত্রে শিরকের দলীল হল,

ألم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب أليم

"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকতো, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" [সূরা শূরা: ২১]

যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের শরীক করে বিধান দেয় এবং শাসন করে, আল্লাহ তাদের মুশরিক বলে ঘোষণা করেছেন।

যারা এসব শাসকদের অনুসরণ এবং আনুগত্য করে, তারা শিরক আত-তাআ করেছে এবং তারাও মুশরিক। এর দলিল হচ্ছে,

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

"যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।" [সূরা আল-আন'আম: ১২১]

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله

"তারা তাদের রাব্বি (আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহর পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩১]

আমরা তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব যারা ইসলামের দাবী করে, কিন্তু ইসলামে সাথে শারীয়াহর সম্পর্ক তৈরীতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আইনের আনুগত্য করে কিন্তু মুসলিম হবার দাবি করে, তারা ৩টি শ্রেণীতে পড়ে,

১। হয় তারা অস্বীকার করে যে, আইন-কানুন এবং রাজনীতিও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা তারা মনে করে, ইসলাম শুধুমাত্র এমন এক ইবাদাত সম্পর্কিত

বিষয়, যার সাথে শাসনের কোন সম্পর্ক নেই। তারা হলো কাফির এরা হলো সেসব Secular বস্তুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন লোক, যারা মুসলিম হবার দাবী করে এবং একইসাথে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে যে, অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতি এর ইসলামের পাশাপাশি অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। যেমন: Socialism, Communism ইত্যাদি।

২। তারা স্বীকার করে যে, ইসলাম শারীয়াহ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত সকল বিষয় বহন করে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এসব লোকেরা হল যানাদিক্কা (কুফফার)।

3. তারা মনে করে যে, ইসলাম যথেষ্ট। কিন্তু তারা এর দ্বারা শাসন করতে যাবে না। তারা শাসকের কারণে শারীয়াহ ছেড়ে দিবে। তারা হল কুফফার বি-ইখতিলাফুল-উলমা (উলামাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য সহকারে)।

<u>শারীয়াহ এবং হুকম (বিচার) এর ফিকহ (বিচক্ষণতা)</u>

হুকুম এর ৩টি পয়েন্ট রয়েছে:

১। আইন প্রণয়ন: কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা সংজ্ঞায়িত করা। এটা একমাত্র আল্লাহর অধিকার যে কেউই এই স্তরে ঘাটাঘাটি করে, সে নিঃসন্দেহে বড় শিরক করেছে।

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ
বিধান একমাত্র আল্লাহরই।
[সূরা ইউসুফ: ৪০]

২। মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার/শাসন করা:

ক. সবসময় আল্লাহর আইন ছাড়া বিচার করা। এটা হল শারীয়াহ প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে। এই ব্যাক্তি কাফির।

খ. দুনিয়ায় কোন লাভের জন্য কখনো কখনো আল্লাহর আইন ছাড়া বিচার করা, কিন্তু শারীয়াহ আইন জারি রয়েছে। এই ব্যক্তি তবুও মুসলিম এবং তার উপর ইবনু আব্বাসের (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বিধি প্রযোজ্য।

***Note:*** হুকম শব্দটি আক্ষরিক মূল হাকামা থেকে এসেছে, যার অর্থ হল বিচার করা, আইন প্রণয়ন করা, মধ্যস্থতা করা। যখন কোন বিষয়ের আয়াত দেখি, যা হুকম ও আল্লাহ শব্দাবলিকে উল্লেখ করছে, তখন এর মানে হল সেই আয়াতটি আইনপ্রণয়ন বিষয়ক/সম্বন্ধীয়। শারীয়াহ অনুসারে আইনপ্রণয়নের বিষয়টি শুধুই আল্লাহর ﷻ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই আমরা যখন এমন কোন আয়াত দেখি যা মানুষের উল্লেখ করছে এবং হুকম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এর মানে হল এই আয়াতটি বিচার করা বিষয়ক। এর কারণ হলো, কুরআনে মানুষকে কখনোও আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়নি, বরং তার দুনিয়ার সকল কার্যকলাপ, ব্যবহারের জন্য আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার করার অধিকার দিয়েছে।

ثُمَّ جَعَلۡنٰكَ عَلٰی شَرِیۡعَۃٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡهَا وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

“অতঃপর আমি আপনাকে সম্পূর্ন আদেশ থেকে একটি শারীয়াহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, অতএব আপনি

এর অনুসরণ করুন এবং মুর্খদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।” [সূরা জাসিয়াহ: ১৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) যখন একই বিষয়ের উপর মন্তব্য করছিলেন, তখন নিম্নোক্ত উপসংহার টেনেছেন,

“আমরা বলি যে, যে কোন গোষ্ঠী যা এমন যেকোন প্রকাশ্য অবিতর্কিত আইন থেকে বেড়িয়ে/বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা মুসলিমদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, তবে এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিম ইমামদের ইজমা অনুসারে ওয়াজিব। ব্যাপারটি এরূপই হবে, যদিও তারা দুটি সাক্ষ্য আবৃত্তি করে।”
[মাজমু' আল-ফাতওয়া, ভলিউম ৪. বাবুল-জিহাদ]

শারীয়াহ এবং তাওহীদ *(*একত্ববাদ*)* এর সম্পর্ক

যখন আমরা কুরআনের আয়াতসমূহের দিকে তাকাই, তখন এটা বুঝা খুবই সহজ যে, তাওহীদ এবং শারীয়াহ এর ব্যবহার পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং শারীয়াহ এর পরিভাষায়, সঠিক বুঝ

হচ্ছে, তাওহীদের বিপরীত হল শিরক, এভাবে তাওহীদের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এর ক্ষতিসাধন করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হয়। একইভাবে, আনুগত্য করা এবং চাকুরি করা বা দায়িত্ব পালন করা বা সেবা করাও তাওহীদের একটি অংশ। সুতরাং, যে কেউ হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারোও আনুগত্য করবে, সে গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ/কিছু) এর আনুগত্যকারী হিসেবে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যা একটি শিরক।

আল-হাফিয ইবন কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন,

“যদি তুমি অন্য কারো কথা-মত অনুসারে আল্লাহর ﷻ আইন এবং তার শারীয়াহ ত্যাগ করো তবে এটি হল প্রকৃত শিরক। যেহেতু আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله

'তারা তাদের রাব্বি (আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহর পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে।' [সূরা আত-তাওবাহঃ ৩১]"

ইমাম তিরমিযি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) আদি ইবনু আবী হাতিম (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ) এর ঘটনাটির ব্যাখ্যার দ্বারা এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, যেখানে তিনি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন,

"'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা তো তাদের ইবাদাত করত না।' নবী ﷺ বললেন, 'অতি নিশ্চিতভাবেই তারা তা করেছিল। তারা হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল এবং হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল, অতঃপর তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। সুতরাং, এভাবেই তারা তাদের ইবাদাত করেছিল।'" [তাফসীরুল-কুরআন আল-আযীম, ভলিউম: ০২]

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বিতি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ), এই আয়াতের উল্লেখ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"এভাবে এটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা মুশরিক তাদের (যারা আইন প্রণয়ন করে) আনুগত্যের দ্বারা এই শিরক হল আনুগত্যের (তা'আ) ক্ষেত্রে, এবং এই প্রণীত আইনসমূহের অনুসরণে, যা আল্লাহ ﷻ যা প্রণয়ন করেছেন তার বিপরীত ও বিরোধী, এর প্রকৃতির স্বরূপই হল শাইতনের ইবাদাত।"

[আদওয়াউল বায়ান তাফসীর কুরআন বিল কুরআন, ভলিউম: ০৪, পৃষ্ঠা: ৬৫]

সূরা আত-তাওবাহ এর সাথে এই আয়াতটি, আয়াত নং ৩১, সত্যিই দৃষ্টান্ত সহকারে পরিষ্কার আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক বুঝিয়ে দিয়েছে। যা এই আয়াতটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে তা হলো, আনুগত্য এবং ঈমান-দুটি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত বিষয়। এই কারণেই আল্লাহ ﷻ শুধু তাদের ঈমানকেই বাতিল বলে ঘোষণা করেন নি, যারা আইনপ্রণয়ন করে, বরং তাদের ঈমানকেও বাতিল বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় এসব আইনপ্রণেতার অনুসরণের মাধ্যমে বড় শিরক করে।

ইমাম আল-ক্বসতালানী (رَحِمَهُ اللَّهُ), এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

“এটি প্রকৃতপক্ষে তা নয়, যাতে তুমি বিশ্বাস কর, বরং এটা হল তোমার অন্তর অনুসারে তোমার যা আছে। এটা তোমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস অনুসারে নয়, অথবা আইনের প্রয়োগ ও আনুগত্য ব্যতীত নয়। তোমার ঈমানের নিদর্শন হলো অনুসরণ ও আত্মসমর্পণ, তা না হলে এটা আত্মসমর্পণ নয়।”
[ইরশাদুস-সারি, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৮২]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন আইনপ্রণেতার আনুগত্য না করা এত গুরুত্বপূর্ণ,

“এটা জানা বিষয় যে, ঈমান হল গ্রহণ করা। ইক্বরার (মূলনীতির প্রতিষ্ঠা) হল এমনকিছু যে, তুমি অন্তরে এর আদেশ ও কাজে বিশ্বাস করেছো, যা হলো আনুগত্য করা। এটা হলো যা কিছু রাসূল ﷺ দিয়েছেন তাতে ঈমান আনা, এবং তিনি যা কিছু আদেশ করেছেন তার অনুসরণ করা। মানুষের উচিত, যখন সে আল্লাহ ﷻ কে গ্রহণ করে, তার পক্ষে

যতটুকু সম্ভব করা, যার মানে হল তারা আল্লাহ ﷻ কে ঘোষণা দেয় এবং তার ইবাদাত করে। আর কুফর মানে হল অবিশ্বাস করা, অনুশীলন না করা এবং অনুসরণ না করা, হয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে, বা ঔদ্ধত্য বা অস্বীকৃতি বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করা থেকে যা কিছু অন্তরে আসে না, সে একজন কাফির।”
[আল-ঈমান আল-আওসাত, পৃষ্ঠাঃ ১৮০-১৮১]

শাইখ ইবনু কায়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّٰهُ) আমাদের জানিয়েছেন যে, ঈমান শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই হয় না, বরং এর থেকে সম্পাদিত কাজের উপর ভিত্তি করে হয়, যা আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে হয়,

“ঈমান শুধুমাত্র তাই নয় যা তুমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস কর, বরং এটা হলো বিশ্বাস যার সাথে অবশ্যই অনুসরণ ও আনুগত্যের সম্মিলন ঘটে। হিদায়াহ (পথনির্দেশনা) মানে এই নয় যে তুমি সত্য জানো, বরং তুমি সত্য জানো এবং এর অনুসরণ কর। বরং, হিদায়াহ (পথনির্দেশনা) এবং তাসদীক্ব (সত্যবাদিতা এবং খবরের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা) মানে হল, এটি

জানা এবং এটির অনুসারে কাজ করা। যদিও কিছু মানুষ জ্ঞানকে হিদায়াহ বলে থাকে, এটা (জ্ঞান) প্রকৃত হিদায়াহ নয়, একজন মানুষকে সঠিক পথপ্রাপ্ত করে। আর সেই সাথে, যখন বিষয়ের (খবর) উপর বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয় আসে এটা সেই বিশ্বাস নয়, যা ঈমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে।”
[কিতাবুস-সালাহ, ভলিউম: ০৯, পৃষ্ঠা: ২০]

আল্লাহর ﷻ কালাম,

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِکَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا

"তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।" [সূরা আন-নিসাঃ ৫৯]

আল আল্লামাহ ইবনু কাসির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

"আর এটা হল আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে আদেশ যে, এমন সবকিছু যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া মতভেদ হয়, তা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া উচিত প্রকৃত বিষয় বুঝার জন্য এবং এটা দ্বীনের মূল বা শাখা-প্রশাখা, সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য। এটা অবশ্যই আল্লাহ ﷻ, তার কিতাব এবং সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। যেহেতু আল্লাহ ﷻ অপর আয়াতে বলেছেন, 'তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি।' যা কিছু কুরআন এবং সুন্নাহ আইন করেছে এবং সাক্ষী দিয়েছে, সেই বিষয়টিই সত্য (হাক্ক)। সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? এরপর আয়াতটি চলতে থাকে, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি।"
[তাফসীরুল কুরআনুল-আযীম, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৫১৮]

এভাবে আল্লাহর ﷻ প্রতি আনুগত্য হল সর্বোচ্চ প্রধান বিষয়, যাতে আল্লাহর ﷻ আইনের সীমানা অতিক্রম করা না হয় এবং আল্লাহর ﷻ আদেশের পবিত্রতা কেউ লংঘন না করে, যা দ্বারা সমগ্র মহাজগৎ আদিষ্ট হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর ﷻ রহমত এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হতে চাই, আমাদের অবশ্যই কিতাব ও সুন্নাহর

ভিত্তিতে একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা নিযুক্ত করতে হবে। এরপর আমাদের অবশ্যই সেই শাসকের আনুগত্য করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর ﷻ আনুগত্য করে। যদি সেই নেতা কোনভাবে পদস্খলিত হয় বা আল্লাহর ﷻ আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে আমরা তার বিষয়ে আর তার আনুগত্য করব না, যেহেতু তা আল্লাহর ﷻ প্রতি অবাধ্যতা সৃষ্টি করবে এবং আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

জুহুদ আল-আমাল, যেখানে কাজের মাধ্যমে জুহুদ হয়। এটা একটি ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যে কথার দ্বারা অস্বীকার করছে না, কিন্তু কাজের দ্বারা অস্বীকার করছে। যখন কেউ আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন তার সরাসরি বিরোধিতা/আপত্তি না করে বিপরীত কোনকিছুর ঘোষণা দেয়, তখন তা সম্পন্ন হয়। যখন কেউ আল্লাহর ﷻ আদেশের সরাসরি বিরোধীতা না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার বিপরীত কাজ করে, তখনও এটি সম্পন্ন হয়।

এর একটি উদারহরণ হল, একজন ব্যক্তি যে একজন শাসক এবং সে জানে যে, বিবাহিত ব্যক্তির

ব্যাভিচারের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। কিন্তু, আল্লাহর ﷻ বিচারবিধান প্রয়োগ করার বদলে সে একটি আইন করল যে, ব্যভিচারীদেরকে শুধুমাত্র কারাবন্দী করা হবে। যদিও সে স্বতন্ত্রভাবে এই আইনকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু এই আদেশের বিপরীত কাজ করার মাধ্যমে সে অস্বীকার করেছে।

ইস্তিব্দাল: এটা হল শারীয়াহকে প্রতিস্থাপন করার কুফর, আর এটার প্রকাশ ৩ ধরনের, যা আল্লামা ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরহীম এর দ্বারা তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে:

ক. আল্লাহর ﷻ আইনকে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। এই ক্ষেত্রে একজন প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং এটিকে শারীয়াহ এর উপর আরোপ করে অথবা সে তার নিজস্ব বাতিল শারীয়াহ তৈরী করে। এর উদাহরণ নিম্নে বলা হয়েছে,

“অথবা তাদের কি এমন কতক শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে

যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” [সূরা আশ-শূরাঃ ২১]

তাছাড়াও, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন, যারা আইনপ্রণয়ন করতে চায়, অথবা এমনকি আইনপ্রণেতার দিকে ধাবিত হয়,

"তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ’র চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?" [সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০]

খ. আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর ﷻ আইন অস্বীকার/পরিত্যাগ না করে, তা অস্বীকার করা। এটি সেই ব্যক্তির কথার ন্যায় সমান ওজনদার যে বলে, "এই নির্দিষ্ট আইনটি বর্তমান সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়, কিন্তু ওই অন্যান্য আইনগুলো এখনও সন্তোষজনক।"

আল্লাহর ﷻ কালাম,

اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡکِتٰبِ وَ تَکۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ یَّفۡعَلُ ذٰلِکَ مِنۡکُمۡ اِلَّا خِزۡیٌ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یُرَدُّوۡنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং কিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।" [সূরা আল-বাকরাহঃ ৮৫]

মূলত, এটি হল একটি আইনকে অস্বীকার করা, আবার অন্য একটিকে স্বীকার করা।

গ. আল্লাহর ﷻ আইনকে অস্বীকার করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পরিত্যাগ/অস্বীকার করা। এটা হয় যখন কেউ আল্লাহর ﷻ আইনকে অস্বীকার করে

এবং আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করতে সবসময় ব্যর্থ হয়।

এই ৩য় ধরনের ইসতিদ্দাল সেসকল আয়াতে বলা হয়েছে, যে সকল আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।"
[সূরা আল-মাইদা: ৪৪]

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম।"
[সূরা আল-মাইদা: ৪৫]

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক।”
[সূরা আল-মাইদা: ৪৭]

আমাদের সামনে যে দলীলসমূহ আছে, তা অনুসারে, যদি কেউ শারীয়াহ অনুসারে বিচার করতে থাকে এবং এ বিশেষ ঘটনাক্ষেত্রে সে শারীয়াহ’র শাস্তি আরোপ না করে, যেহেতু অপরাধী তার ঘনিষ্ট বন্ধু,

পরিবারের সদস্য ইত্যাদি, এই ক্ষেত্রে আমরা একে বলি, ‘কুফর দুনা কুফর’ (একটি কুফর, যা কুফর হতে কম), একটি ছোট কুফর।

কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি আইনকে পরিবর্তন করে, শুধুমাত্র একবার একটি ব্যক্তির জন্য নয়, বরং আগত সবসময়ের জন্য সে আইনকে পরিবর্তিত করে ফেলে, এটা হল একটি বড় কুফর। কিন্তু, যদি সে শারীয়াহ এর বিদ্যমান আইনের মধ্যে নতুন কোন শর্তারোপ করে, তবে এটা হল কুফর ফাউক্বা কুফর (কুফরের উপর কুফর)।

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।
[সূরা আল-মাইদা: ৪৪]

এটা হল সম্পূর্ণ অনাবৃত ও নিশ্চিত কুফর যা ভয়ংকর অসন্তোষজনক এবং ভয়ানক কদাকার। শারীয়াহকে অগ্রাহ্য করে, আল্লাহর ﷻ ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই

অর্জন করা যায় না, আর এটা এমনকিছু, যা থেকে নির্ভেজাল মুমিনদের বহুদূরে অবস্থান করা উচিত।

<u>ফিসক্ব কি এবং ফাসিক্ব কে?</u>

শারীয়াহ এর পরিভাষায় ফিসক্ব হল, বিদ্রোহের সাথে কোন পাপকর্ম করা এবং আত্মার প্রকৃতি (আল্লাহর ইবাদাত) এর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী আচরণকে বহাল রাখা।

ফিসক্ব আল-আকবারঃ এই ফিসক্ব (বিদ্রোহ) একজনকে ইসলামের বহির্ভূক্ত করে এবং এই কার্যসাধনকারীকে বড় ফাসিক্ব (ইসলামের পরিধির বাহিরে) হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এ ধরনের পাপের মধ্যে পড়ে, আল্লাহর ﷻ আদেশকে স্বীকার করতে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে/চলতে অসম্মতি প্রকাশ করা, যেমন করেছিল শাইতন। এছাড়াও হতে পারে, আল্লাহ ﷻ যা হালাল করেননি, তা হালাল বলে প্রণয়ন করা, এবং আল্লাহ ﷻ যা হারাম করেননি, তা হারাম বলে প্রণয়ন করা। এ ধরনের কাজ বড় ফিসক্ব এর দিকে ধাবিত করে, এবং আল্লাহ ﷻ এ ধরনের পাপ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর পূর্বেই নির্ভেজাল তাওবাহ

করা হয়। আরেকটি উদাহরণ হল, মানুষকে হারাম বিষয়ের, যেমন: Alcohol, Narcotics, ও অন্যান্য জিনিসের License দেওয়া।

বড় ফিসক্ব এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক।"
[সূরা আল-মাইদা: ৪৭]

এভাবে, যারা শারীয়াহ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে সবসময়ের জন্য দিয়ে শাসন/বিচার করে, নিশ্চয়ই তারা বড় ফাসিক (বিদ্রোহী পাপী, যারা কাফির)। আর যারা নিজেদের জন্য নিজস্ব বাতিল শারীয়াহ উদ্ভাবন করে, এটা তাদের জন্য আরোও বড় ফিসক্ব (বিদ্রোহ) এর প্রমাণ।

একটি ব্যাপারে রয়েছে, যে ক্ষেত্রে শারীয়াহ এর ক্ষেত্রে ছোট ফিসক্ব সংঘটিত হতে পারে। এটা হয়, যখন

একজন বিচারক বা শাসক আল্লাহর ﷻ নাযিলকৃত আইন দ্বারাই বিচার বা শাসন করে, কিন্তু কখনো সে একটি ব্যাপারের ক্ষেত্রে দলীল নিয়ে খেলা করে এবং তার দুনিয়াবি কামনা বাসনার দিকে ঝুকে পড়ে। এটাকে 'ফিসক্ব দুনা ফিসক্ব' বলে, যা এক প্রকার ছোট ফিসক্ব। কিন্তু, যা দ্বরুরী তা হল, এ ধরনের ব্যক্তি তখনই ছোট ফিসক্ব এর অপরাধী হবে, যখন শারীয়াহ বহাল থাকে।

যে ব্যক্তি, তার ঐ খেলাকে একটি প্রতির্ষ্ঠিত বিষয়ের রূপ দেয়, অথবা তার বাতিল বিষয়টিকে আইনে পরিণত করে সে বড় ফিসক্ব করেছে, এবং এর থেকে কোন মুক্তি নেই। এভাবে, একটি ফিসক্ব করা ও এর অপরাধী হওয়া, যা কিনা ছোট ফিসক্ব, এবং ছোট ফিসক্ব (যেমনঃ ব্যাভিচার, মদ খাওয়া, ইত্যাদি) এর প্রণয়ন প্রবর্তন করা-এ দুয়ের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ছোট ফিসক্ব-এর প্রণয়ন প্রবর্তন করা হলো বড় ফিসক্ব এবং এ পাপের দায়ী হলো বড় ফাসিক।

<u>যুলম কি এবং যলিম কে?</u>

শারীয়াহর পরিভাষায়, যুলম হল এমন পাপকর্ম করা, যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজেকেই অত্যাচার করছে কারণ যুলম-শব্দের অর্থ অত্যাচার। আর যে ব্যক্তি যুলম করছে, সে আল্লাহকে ﷻ অত্যাচার করছে না, বরং প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই অত্যাচার করছে।

যুলম আল-আকবার: এটা হল সেই যুলম, যা একজনকে বড় যালিম (একজন যালিম, যে ইসলামের বহির্ভূত) হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এ ধরনের যুলম, শিরক অথবা কুফর হতে পারে, এবং মুর্তিপূজা, কবরপূজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, এবং এমনকি প্রশাসনপদ্ধতি ও সিস্টেম এর উপাসনার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

“হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কোরো না। নিশ্চয়ই শিরক তো অবশ্যই বড় যুলম।”
[সূরা লুকমানঃ ১৩]

এভাবে আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে বড় শিরককে অতিকায়/বিশাল যুলম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

যে ব্যক্তি এই যুলম করে, সে অন্যদের উপরও অত্যাচারী হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মানুষকে বাতিল শারীয়াহ এর দ্বারা শাসন করা, অথবা মানুষের জন্য মানবরচিত আইন দ্বারা শাসিত হওয়ার বিধান কর এবং এটিকে অনুমতি প্রদান/হালাল করা। এই কারণেই আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون

“তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ এর বিধান কামনা করে?” ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই আয়াতের তাফসীর থেকে এটি সম্পূর্ন পরিষ্কার যে, তিনি, যারা আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার শাসন করে না, তাদের সাথে তাতারদের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, যদিও তাতাররা আল-ইয়াসিক দ্বারা শাসন করেছিল, যা বিভিন্ন ধর্মের আইন থেকে নেওয়া হয়েছিল, যেমনঃ ইহূদীধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য। এবং এর মাঝে এমন আইনও ছিল যা চেঙ্গিস খান, নিজের কামনা-বাসনা থেকে তৈরী করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি তা অপেক্ষা কম খারাপ যা

পশ্চিমারা প্রণয়ন করেছে, যার সাথে ইসলাম বা অন্য কোন প্রকার ধর্মের আইনের কোন সম্পর্ক নেই।

## আল্লাহর ﷻ আইন দ্বারা শাসন/বিচার না করা বড় কুফর, এ সম্পর্কিত দলীল:

যখন আমরা আল্লাহর ﷻ আইন ব্যতীত শাসন/বিচার করার ব্যাপারে এটিকে বড় কুফর বলছি, তখন আমরা সে সকল শাসক/বিচারকদের কথা বলছি না, যারা কুচিন্তা/অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর আইন ছাড়া বিচার/শাসন করে। যেমন: হয় তাকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, ফলে ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ করেছিল ইত্যাদি। আমরা সরাসরি সে সকল শাসক বিচারকদের সাথে এটিকে সম্পর্কিত করছি, যারা সব সময়ের জন্য আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার শাসন করে এবং তাদের বিচারকার্য সুরক্ষিত করার জন্য আইন তৈরী করে ও এর প্রয়োগ করে। যে এরূপ করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম সাক্ষীস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করছি,

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।" [৫ঃ৪৪]

ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ), এই আয়াতের ব্যাপারে একটি উক্তি করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, এই আয়াতটির কুফর হল 'কুফর দুনা কুফর' (কুফর, যা কুফর অপেক্ষা ছোট। [তাফসীর ইবনু কাসির]

কিন্তু, ইবনু আব্বাসের (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আরেকটা উক্তি করেছেন, এই একই আয়াত সম্পর্কে, যেখানে তিনি বলেছেন, "সেই কুফরটি তার জন্য যথেষ্ট কুফর, মানে এটি হল বড় কুফর। [আখবারুল-কুদাআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৪০-৪৫]

ইবনু মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ইরাকের মানুষদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, "রিশা (ঘুষ নেওয়া) কি?" তিনি জবাব দিলেন, "এটা হল সুহ্ত (হারাম উপার্জন)।" তারা বলল, "না, আমরা বোঝাতে চেয়েছি শাসনের ক্ষেত্রে।" তিনি তারপর বললেন, "এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফর। [তাফসীর ইবনু কাসীর]

শুধুমাত্র এই আয়াতটি এবং এই আয়াতটির তাফসীর দেখার মাধ্যমেই, আমরা এটা দেখতে পাই যে, আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন, তা দ্বারা শাসন/বিচার করতে শুধুমাত্র ব্যর্থ হওয়াটাই বড় কুফর, আর তার কথা তো বলাই বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহর ﷻ পাশাপাশি আইন প্রণয়নও করে।

যাইহোক, আজ এটি বড়ই দুঃখজনক যে, কিছু ব্যক্তি বিচ্যুত হয়ে সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে এই আয়াতের কঠোর আদেশ ও উপরে উল্লিখিত দুজন সাহাবা (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) এর বর্ণনার ব্যাপারে বিকৃতি উদ্ভাবন করেছে। যা প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর উক্তি, 'কুফর দুনা কুফর' যা শারীয়াহ এর অপব্যবহারকারী ও বিকৃতিসাধনকারীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়েছে। যাহোক, যারা এরূপ করতে চেয়েছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে উসূলুল-ফিকহ এর ব্যাপারে এক গভীর গর্তে গিয়ে পড়েছে। তারা যে ভয়াবহ বিপর্যয়কারী ভুল করেছে, তা আমরা নিম্নে বর্ণনা করেছি,

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমিন উল্লেখ করেছেন যে,

“একজন সাহাবীর উক্তির কোন অধিকার নেই একটি আয়াতকে নির্দিষ্ট করার যা আল্লাহ ﷻ সাধারণ করেছেন।”
[আল উসূলু মিন ইলম ইল-উসূল, পৃষ্ঠাঃ ৩৩-৪৪]

সুতরাং, উলামাদের অনুসারে, এটা খুবই পরিচিত নিয়ম যে, একজন সাহাবীর উক্তি কুরআন এর একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে না, যা আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্টভাবে সাধারণ করেছেন। আর না একজন সাহাবী পারেন কুরআন এর একটি নির্দিষ্ট আয়াতকে সাধারণ করতে, যা আল্লাহ ﷻ নিজে নির্দিষ্ট করেছেন, যতক্ষণ না এরূপ বিধি-নীতি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণের দলীল পাওয়া যায়।

এমনকি আজকের শাসনব্যবস্থার আলিমগণ এই দলীলটি অস্বীকার করতে পারেন না। আর এখানে আমরা পেলাম শাইখ উসাইমিনকে তার বই উসূলুল-ফিকহে এই দলীলটিকে উল্লেখ করতে।

যেমনটি আমরা দেখলাম যে, ইবনু মাসঊদ এবং ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) এর সকল বর্ণনাই সঠিক তাই, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ এর মানুষ হিসেবে আমরা এগুলো গোপন করি না, যেহেতু সবগুলো দল সঠিক স্থানে বসিয়ে অনুসন্ধান করলে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা মিলে।

তাছাড়া, এটিও উলামাদের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, “যদি কুরআন থেকে অন্য আরেকটি উক্তি না থাকে তবে একজন সাহাবীর উক্তি গ্রহণ করতে হবে।”
[আল উসূলু মিন ইলম ইল-উসূল, পৃষ্ঠা: ৩৩-৪৪]

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ এর একটি 'গোল্ডেন রুল' রয়েছে, যেটি বলে, কুরআন বা সুন্নাহ এর যে কোন আয়াতের প্রয়োগ হবার ও সেটি নিয়ে কাজ করার অধিকার রয়েছে, এমনকি যদিও তা জ্ঞানহীন ব্যক্তি-বিশেষদের কাছে বিরোধীমত/অসদৃশ মনে হয়।

শারীয়াহ অনুসারে শাসন/বিচার না করা এবং কুফর এর মধ্যে সম্পর্ক*:*

এর জন্য ঐ আয়াতটি অপেক্ষা উত্তম কিছু নেই। আল্লাহ ﷻ প্রকৃতপক্ষে কুফর এবং তার শারীয়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার মাঝে একটি দৃঢ় সম্পর্ক করেছেন। এটি একটি ধারালো চ্যালেঞ্জের ন্যায় দাড়িয়ে আছে শুধু সে সকল শাসক/বিচারকদের দিকে নয়, যারা শারীয়াহ পরিত্যাগ করে, বরং এমনকি সাধারণ মুসলিমদের দিকেও, যারা শারীয়াহ নিজের হাতে তুলে নিয়ে আল্লাহ ﷻ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের এক বা একাধিক ওয়াজিব/বাধ্যতামূলক বিষয় বাদ দিতে পারে।

ইমাম আবূ বাক্কর আল জাসসাস (رَحِمَهُ اللّٰهُ), এই আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

[এই ইমাম সবচাইতে বেশী পরিচিত তার কাজ, আহকামুল-কুরআন এর জন্য এবং আহলুল-ইলমদের (জ্ঞানী ব্যক্তিদের) মাঝে তিনি একজন প্রখ্যাত ইমাম।]

“এই আয়াতে একটি নিদর্শন ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহর ﷻ হুকম/আদেশ থেকে কোন কিছু হটিয়ে দেয় বা পরিত্যাগ করে এবং যারা আল্লাহ ﷻ বা রাসূল ﷺ এর হুকম/আদেশ থেকে এমনকি কোন

অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও পরিত্যাগ করে, সে ইসলাম পরিত্যাগ করেছে; হয় তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বা এর জন্য এরূপে কাজ করার মাধ্যমে যে, সে এটির ব্যাপারে সন্দিহান, অথবা এমনকি যদি সে এটি পরিত্যাগ করে কারণ সে তা মেনে নিতে চায় না, অথবা তার এটির ব্যাপারে অসন্তোষ রয়েছে। এটা হলো তা অনুসারে, যা সাহাবাগণ মত করেছিলেন তাদের রিদ্দাহ এর ব্যাপারে যারা যাকাহ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সাহাবাগণ শুধু এ উপসংহারই টানেন নি যে, যাকাহ না দেওয়ার মাধ্যমে এই লোকেরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, বরং তারা তাদেরকে হত্যাও করেছিলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস/দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ হল, আল্লাহ ﷻ আইন করেছেন যে, যারা রাসূলকে ﷺ তার শাসন ও বিচারকার্যে অনুসরণ করে না, তারা আহলুল-ঈমান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" [আহকামুল কুরআন, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ১৮১]

এই জায়গায় এই বাস্তবতাটি বিস্তৃত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ ﷻ ঈমান এবং কুফর কে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যদি একটি ভূখন্ড ঈমানী আলোর আইন দ্বারা শাসিত না হয়, তবে কুফর এর অন্ধকারের

আইন সেটির শাসন করে। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল-মাকদিসী আল হাবালী (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ), এই পয়েন্টটি বিস্তারিত বর্ণনার সাহায্যে পরিষ্কার করেছেন,

[এই বিখ্যাত হানবালী আলিম তার সময়ে একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং সব সময় সত্য কথা বলার জন্য পরিচিত ছিলেন। তার ঘোষণা বিবৃতিসমূহ এরূপ যে, যদি তার বইটি অনুবাদ করা হত, তবে সমগ্র উম্মাহ একটি স্বর্ণখনি পেত, যার উত্তরাধিকার তারা সবাই হত।]

"প্রত্যেক দার (বাড়ি/আবাস) যার উপর মুসলিমদের আইন কর্তৃত্বশীল, তবে এটি দারুল-ইসলাম। আর যদি একটি দার (বাড়ি/ আবাস) এর উপর কুফর এর আইন কর্তৃত্বশীল হয়, তবে এটি দারুল-কুফর, আর উল্লিখিত এই দুটি দার (বাড়ি/আবাস) ছাড়া আর কোন বাড়ি আবাস নেই।
[আল আদাবুশ-শারীয়াহ ওয়াল-মিনাহ ইল-মার’ইয়্যাহ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ১৯২]

মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন/বিচার করার কুফর ও শিরক*:*

এই বিষয়ে সাহাবাগণ কি বলেছেন?

আযহারি উল-কুদাআ বইটিতে বর্ণিত আছে যে, মানবরচিত বিধান সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেছেন,

حدثنا عن حسن ابن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال : كفى به كفره

“হাসান ইবনু আবী আর-রাবিঈ আল-জুরজানী (رَحِمَهُ اللَّهُ) [তার নাম ইয়াহইয়া ইবন জাজ। তিনিও বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। আবী হাতিম (رَحِمَهُ اللَّهُ) তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত এবং তিনি আমার শাইখদের মধ্যে অন্যতম। ইবনু হিব্বান (رَحِمَهُ اللَّهُ) তার উল্লেখ করেছেন বিশ্বস্ত মানুষদের সাথে। ইবনু হাজারও তাদের মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন যারা বিশ্বস্ত। বর্ণনার বাকি অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং সর্বোচ্চ গুণাবলির অধিকারী।]

থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ‘আমরা আব্দুর রাযযাক (رَحِمَهُ اللَّهُ) [তিনি একজন বিশ্বস্ত ইমাম] থেকে, তিনি মামার (رَحِمَهُ اللَّهُ) [সকল আলিমগণ

তাকে বিশ্বাস করেন]  থেকে, তিনি ইবনু তাউস (رَحِمَهُ اللَّهُ) [তিনি এবং তার পিতা উভয়েই বিশ্বস্ত, এবং তার পিতা তাউস, ইবনু আব্বাস এর একজন ছাত্র] থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে শুনেছেন, যিনি বলেছেন, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আল্লাহর এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন,

‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।’ [৫:৪৪]

তিনি ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেছেন, 'এটা যথেষ্ট কুফর'।”

[আখবারুল কুদাআ, ইমাম ওয়াকিআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৪০-৪৫]

[বর্ণনাকারী হলেন, মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ইবনু হাইয়্যান (رَحِمَهُ اللَّهُ), যিনি আখবারুল কুদাআ এর লেখক আল-ওয়াকিআ (رَحِمَهُ اللَّهُ) (মৃত্যু হিজরী ৩০৬ সন/ ১১৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিসেবে পরিচিত। ইবন হাজার আল-আসক্বলানি (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন, ‘তিনি বিশ্বস্ত।’ আল-খতিব আল বাগদাদি (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই শাইখ আত-তারিক কিতাবুশ-শারিফ (সম্মানিত কিতাবের পদ্ধতি) এরও লেখক, যা কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ও আবৃত্তিগত পার্থক্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করে, বলেছেন, তিনি জ্ঞানী, বিশ্বস্ত এবং ইতিহাস ও মানুষ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন।]

সাঈদ ইবন জুবাইর (رَحِمَهُ اللهُ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) নিরাশভাবে এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে,
“তোমরাই সর্বোত্তম মানুষ যখন যা কিছু তোমাদের জন্য সুমিষ্ট তা কুরআনে থাকে। আর যা কিছু রুঢ়, কঠোর ও টক তা কিতাবীদের জন্য থাকে (বর্ণনাকারী বলেছেন, ‘ঠিক যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ৩টি আয়াত মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য’)।”

আরোও বর্ণিত আছে যে, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেছেন যে, “তোমরাই সর্বোত্তম মানুষ যদি যা কিছু কুরআনে সুমিষ্ট, তা তোমাদের জন্য থাকে।" তারপর তিনি যোগ করলেন, "যে কেউ আল্লাহর আইন/শাসন/বিচার পরিত্যাগ/বাতিল (জাহিদান) করে, এবং এরপর সে একজন কাফির।"
[আখবারুল-কুদাআ ইমাম ওয়াকিআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৪১]

***Note:*** উসূলুল-ফিকহ এর অন্যতম মূলনীতি যে, ওহী এর মধ্যে যা কিছু সাধারণ, তা নাযিলের কারণের উপর ভিত্তি করে বর্জন করা যাবে না।

ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) যা বলেছেন, তা ছাড়াও আরোও একজন সাহাবী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

[আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) সেই একই সাহাবী, যিনি আনন্দের সাথে বলেছিলেন, "কুরআন থেকে কোন একটি আয়াত নেই যা নাযিল করা হয়েছিল, এ ব্যতীত যে, আমি এর নাযিল হবার কারণ জানতাম (বুখারী দ্বারা বর্ণনাকৃত)। ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বড় হবার পূর্বে তিনিই ছিলেন কুরআনের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচাইতে জ্ঞানী সাহাবী।]

এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, যখন তিনি কিছু মানুষের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, রিশা (একটি ঘুষ) কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "এটা সুহত (অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ)।" তখন তারা বলল, "না, আমরা বিচার এবং শাসনের ক্ষেত্রে বোঝাতে চাইছি।” তিনি বললেন,

ذاك **الكفر**

“এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফর।”

[তাফসীর ইবনু কাসির, সূরা মায়িদা: ৪৪]

এ সকল তথ্য ছাড়াও, আমাদের সাহাবা (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) এর শাসন/বিচার সম্পর্কিত ইজমা সম্পর্কে

গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ যা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে,

প্রখ্যাত সাহাবী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেছেন,

“আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে এটি দিয়ে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন, (এবং তিনি তরবারির দিকে ইশারা করেছেন) যে কেউ এর থেকে বিচ্যুত হবে (এবং তিনি কুরআনের দিকে ইশারা করেছেন)।”
[মাজমু’আল ফাতওয়া, ভলিউম: ০৫ এ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ; মুসনাদ আল আহমাদ ইবনু হানবাল]

তাদের সম্পর্কে ঠিক এটাই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াহ বলেছে, যারা আল্লাহ جل جلاله যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে, শারীয়াহ পরিবর্তন করে বা আইন প্রণয়ন করে। এটা বড় কুফর। যদি তারা কিছু ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তা কুফর যা কুফর অপেক্ষা ছোট হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে আমরা এটাকে বলতে পারি যে, সেটা একটি ছোট কুফর।

এটা ইবরহীম ইবনু আল-হাকাম ইবনু জাহির (رَحِمَهُ اللَّهُ) থেকে তার পিতা আস-সুদ্দাই (رَحِمَهُ اللَّهُ) থেকে সম্পর্কিত যিনি বলেছেন, “ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেছেন, 'যে কেউ বিচার করার ক্ষেত্রে যালিম ছিল এবং এবং সে তা জানে, জ্ঞান ছাড়া বিচার করে অথবা বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ নেয়, তবে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।” [আখবারুল কুদাআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৪১]

যদিও এই উক্তিটি খুবই কঠোর দেখায়, আমাদের খুবই কাছ থেকে এটিকে দেখতে হবে। উপরে উল্লিখিত অপরাধসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলে, এই হাদিসটি আমাদের দেখায় যে, এটা হয় বড় কুফুর অথবা ছোট কুফর। বিচারকার্যের তীব্রতার উপর নির্ভর করে, আমরা কুফর এর মাত্রা নির্ধারণ করতে পারি যে, সেটা বড় নাকি ছোট। যুলম/অত্যাচার এর ধরনের উপর নির্ভর করে, আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাই। যদি যুলম/অত্যাচার মানুষের হাক্ক/অধিকারকে স্পর্শ করে, যেমন হয়েছিল যখন আল-হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস-সাক্বাফি এর ব্যাপক যুলম/অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল, তবে এটি একটি বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ), তবে তা কাউকে ইসলামের পরিধির বহির্ভূত করে

দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এভাবে এটি ছোট কুফর; যাহোক, যে কোন মুহূর্তেই যুলম/অত্যাচার আল্লাহ ﷻ এর হাক্ক-কে স্পর্শ করে, যেমন: আইন প্রণয়ন, তবে কোন সন্দেহ ছাড়া এটি বড় কুফর এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি বিরত হয় বা প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিকে তার পদ থেকে সরানো হয়। আর জেনে বা না জেনে আল্লাহর ﷻ আইন দ্বারা সবসময় বিচার করাও একই নিয়ম-বিধি ও শর্তাবলির মধ্যে পড়ে। আমরা এখন ঘুষ বিষয়টি নিয়ে দেখব,

ইবন মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) অপর এক ক্ষেত্রে সুহত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যখন বিচারকার্যে রাশা ব্যবহৃত হয়েছে, ইবন মাসঊদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) জবাব দিলেন, "না, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী), যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম (অত্যাচারী), যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তার ফাসিক (বিদ্রোহী পাপী)।"

[আখবার উল-কুদাআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৩]

***Note:*** আমরা এটি জানিয়ে দিতে চাই যে, ঘুষ নেয় এমন প্রত্যেক পাপী বিচারকই কাফির নয়, কিন্তু যদি সে শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার/শাসন করে যার সংবিধানের আইনসমূহ শারীয়াহ থেকে নেওয়া হয় নি, তবে সে অতি নিশ্চিতভাবে কাফির। সেই আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করার জন্য ঘুষ নেওয়াও বড় কুফর, কিন্তু ঘুষ খেয়ে আল্লাহর ﷻ বিচারকার্যকে কিছু ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন করা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও ঘটনা/প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বড় কুফর বা ছোট কুফর হতে পারে। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল, এটা দেখানো যে, সাহাবাদের উক্তি এই বিষয়গুলোতে কত ওজনদার। এই সময়ের আলিমগণ ও মুসলিমরা এই বুঝটিকে খুবই সহজ ও হাল্কাভাবে নিচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি এরূপ হয়ে যায় যে, আমরা এই বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে পড়ি যে, কোথায় গিয়ে শাসক বিচারকদের শারীয়াহ শেষ হয়, এবং কোথায় গিয়ে আল্লাহর ﷻ শারীয়াহ শুরু হয়।

পূর্ববর্তী আলিমগণ এই ব্যাপারে কি বলেছেন***?***

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরিস আশ-শাফিঈ (رَحِمَهُ اللَّهُ) নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি করেছেন,

"যে কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এর দলীল ব্যতীত নিজের কথাকে অনুমোদন করে, সে একজন পাপী হবে। সে হবে একজন বদকার এবং ভুল, এমনকি যদিও সে কুরআন এর সাথে মাঝে মাঝে মিলে যায়, কারণ যখন সে এর সাথে মিলে যায় তখন সে এর জন্য নিয়্যাহ করে নি।"
[আর-রিসালা, বিষয় নং. ১৭৮]

এটা ইমাম শাফিঈ (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর একটি গোল্ডেন রুল, কিন্তু তিনি এই বিধিটি তাদের জন্য করেন নি যারা ইসলামিক শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার/শাসন করে। তার সময়ে মুসলিম ভূখন্ডসমূহ এই ময়লা/আবর্জনা থেকে মুক্ত ছিল। তিনি এই বিধিটি সে সকল আলিমদের জন্য করেছিলেন যারা ইজতিহাদ করেন।

ইমাম আশ-শাফিঈ (رَحِمَهُ اللَّهُ) আরোও সম্পর্কিত করেছেন,

“মুসলিমরা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, যে কেউ নিশ্চিতভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটি সুন্নাহ বা উক্তি জানে, আর সেটা অপর কারোও মত এর কারণে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কারোই কোন উক্তি করা উচিৎ নয়, যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ইতঃপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।”
[ই'লাম আল-মুওয়াক্কক্কইন, ভলিউম: ০২, পৃষ্ঠা: ২৮৩]

আল আল্লামাহ ইবন কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

“যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।” [সূরা আনআম: ১২১]

“এর মানে হলো, যখনই তুমি অন্য কারোও মত/উক্তি এর কারণে তোমার উপর দেওয়া আল্লাহর ﷻ আদেশ ও তার নাযিলকৃত আইনসমূহ থেকে কিছু পরিত্যাগ কর, এবং তাদেরকে তার উপর প্রাধান্য দাও, এটা হল শিরক (বড় শিরক), যেহেতু আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله

“তারা তাদের রাব্বি (আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহর পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে।” [সূরা তাওবা: ৩১]

যারা বলে, আমাল/কাজ এর মাধ্যমে কোন শিরক বা কুফর হয় না। তারা বিদআতী মানুষ, যেহেতু এটা কুরআন এবং সুন্নাহে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আয়াতে এবং আরোও অনেক জায়গায়। এরা হলো এই বিষয়টি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে, কিছু কুফর আল-আমালী (আমাল/কাজের দ্বারা সংঘটিত কুফর) একজন ব্যক্তিকে সহজেই ইসলামের পরিধির বহির্ভুক্ত করে দিতে পারে। যেমন: এমনকিছুর অনুসরণ করা, যা কুরআনের পরিষ্কার আয়াতসমূহের বিরোধী এবং সুন্নাহের পরিষ্কার বর্ণনাসমূহের বিরোধী।

আল আল্লামাহ আল-ফাকিহ, আল-মুফাসসির সুফিয়ান আস-সাওরি আয-যাইদি (رَحِمَهُ اللهُ), মহান ২য়

প্রজন্মের ইমাম, মায়িদা: ৪৪, ৪৫, ৪৭, সম্পর্কে বলেছেন,

"প্রথমটি হল এই জাতির জন্য (মুসলিমরা যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসন/বিচার করে না), দ্বিতীয়টি হল ইহূদীদের জন্য (শারীয়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার জন্য) এবং তৃতীয়টি খ্রীষ্টানদের জন্য (শারীয়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার জন্য)।"
[তাফসীর সুফিয়ান আস-সাওরি এবং আখবার আল-কুদাআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৪০]

ভারতবর্ষের আলিম, আল আল্লামাহ আবু তাইয়্যিব মুহাম্মাদ আবাদি (رَحِمَهُ اللّٰهُ), আস-সাওরি (رَحِمَهُ اللّٰهُ) দ্বারা উল্লেখকৃত একই আয়াতসমূহের ব্যাপারে নিম্নোক্ত উপসংহার করেছেন,

"আর এই উক্তিটির সত্যবাদিতা যে, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির, হল আল-বারা এর হাদিসটি, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, আয়াতসমূহ (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭) প্রেরিত হয়েছিল সকল কাফিরদের সম্পর্কে। আর যে কেউ দাবি করে যে, নবীদের আনিত

আল্লাহর আইন/বিধানসমূহ থেকে কোন একটি আইন/বিধান মিথ্যা, তবে সে একটা কাফির।”
[আউন আল-মাবুদ, ভলিউম: ০৯, পৃষ্ঠা: ৩৫৫-৩৫৬]

[তিনি হিন্দের একজন বিখ্যাত আলিম এবং তার বই আউন আল-মাবুদ এর জন্য পরিচিত, যার মধ্যে তিনি বিচারের উদ্দেশ্যে সতর্কতার সাথে সকল অধ্যায়সমূহে তার মন্তব্য টীকাসহ সমন্বিত করেছেন।]

আল আল্লামাহ্ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল কুরতুবি (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন,

“যে কেউ আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, কুরআন এর সাথে জুহুদ (অস্বীকার) করে, এবং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এর সাথে রদ (প্রত্যাখ্যান) করে, তবে সে একজন কাফির। এটাই হল ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ও মুজাহিদ (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর উক্তি যে, এই বিষয়ে এই আয়াতটি সাধারণ। ইবন মাসউদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এবং আল-হাসান (رَحِمَهُ اللَّهُ) আরোও বলেছেন যে, এটা সকলের জন্য সাধারণ, যে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, হোক তা মুসলিম, ইহুদী বা অন্যান্য কুফফার।”
[জামি' উল-আহকাম ফীল-কুরআন, ভলিউম: ০৫. পৃষ্ঠা: ১৯০]

আল আল্লামাহ ইবনু ক্কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

“আর এটা সত্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার দুইটি শ্রেনীতে পড়ে, বড় কুফর বা ছোট কুফর, বিচারকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দ্বারুরিয়্যাত সম্পর্কে যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এবং সে অবাধ্য হয়ে এর সীমালঙ্ঘন করে, একথা পরিষ্কারভাবে জেনে যে, সে শাস্তির প্রাপ্য, তবে এটা একটা ছোট কুফর।

আর যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে নিশ্চিতভাবে এটা বড় কুফর। আর যদি সে অজ্ঞ হয়ে থাকে বা পাপ করে থাকে তবে সে তাদের শ্রেণীতে পড়ে যারা পাপ করে।”
[মাদারিজ উস-সালিকীন, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ৩৩৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনু কায়্যিম আল জাওজিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ), রাসূল ﷺ এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ﷻ আইনকে গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন,

“রাসূল ﷺ এর উপর নবী হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হল, তুমি তাকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। তোমার সবকিছু তুমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে যেন তিনি তোমার কাছে তোমার সত্বা ও তোমার নিয়মনীতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হন। আর তুমি রাসূল ﷺ এর হাদীস ছাড়া অন্য কোন হিদায়াতই গ্রহণ করবে না। আর সে (প্রসঙ্গ ব্যক্তি) কাউকে নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করবে না। আর নবী ﷺ এর আইন কানুন নীতিমালা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকবে না,

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

তবে না; আপনার রবের কসম। তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়।”

[সূরা আন-নিসাঃ ৬৫]” [মাদারিজুস-সালিকীন, ভলিউম: ০২, পৃষ্ঠা: ১১৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) তার ফাতাওয়ায় শক্ত কথা বলেছেন,

“যখনই কোন আলিম শাসকের হুকম (আইন/বিধান) এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা কুরআন ও সুন্নাহ এর বিরোধী, সে একটা কাফির (অবিশ্বাসী) এবং একটা মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী), যে এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্য যোগ্য। এই বিধিটি সেসকল আলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঝাপ দিয়েছে এবং যোগদান করেছে মোঙ্গলদের সাথে তাদের ভয়ে এবং তাদের থেকে সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যে। এই উলামাগণ কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মোঙ্গল শাহাদাহ (সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ﷻ এক এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার রাসূল) বলছে এবং তারা মুসলিম ছিল।”
[মাজমু আল ফাতওয়া, ভলিউম: ৩৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৩]

এটা যেন তিনি আজকের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করছেন।

মহান আল্লামাহ, তার সময়কার শাইখুল ইসলাম, তার সময়কার কুরআন হিফযকারীদের শাইখ ফকিহ, মিশরের সকল শারীয়াহ কোর্ট এর বিচারকদের প্রধান, ইমাম বাদর উদ-দ্বীন আল আয়নী (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন,

“যে কেউ নবীগণের শারীয়াহ পরিবর্তিত করেছে এবং তার নিজস্ব শারীয়াহ বানিয়েছে, তার শারীয়াহ বাতিল। এসকল লোকদের অনুসরণ করা হারাম,

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। [সূরা আশ-শূরাঃ ২১]

এই কারণে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা শক্ত করে তাদের পরিবর্তিত শারীয়াহ আঁকড়ে ধরেছিল, এবং আল্লাহ ﷻ মানবজাতির উপর মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।”
[উমদাতুল-ক্বারী: ভলিউম: ২৪, পৃষ্ঠা: ৮১]

[মৃত্যু হিজরী ৮৫৫ সনে/১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একজন মহান হানাফি আলিম। এই আলিম, তার কৃতিত্বসমূহ এবং তার জীবনী তার কাজ, উমদাত উল-ক্বারী, ভলিউম: ২৪, পৃষ্ঠা: ০১ এ উল্লেখ্য]

আল আল্লামাহ শিহাবুদ্দীন আল-আলুসী (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

“যে কেউ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করার ব্যাপারে কোন দৃঢ়বিশ্বাস নেই, তার কুফর এর ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই, এবং সেই সাথে যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, তার বিশ্বাসের অস্বীকৃতির সাধারণ রূপরেখাও একই শ্রেণীভুক্ত। এভাবে এখানে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই যে, যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে একটি বিষয় বা জিনিস বিচার করে না, তবে সে ওহীর ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণকারীদের

অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার কুফর এর ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।”
[তাফসীর রুহ আল-মাআনি, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ১৪৫]

[এই ব্যক্তি ছিলেন বাগদাদের একজন মুফতি এবং একজন বড় হানাফী আলিম, এবং শারীয়াহ কোর্ট এর প্রধান। তার শব্দাবলি মুসলিম বিশ্বে বিশাল ওজন বহন করে এবং এখন পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাকে সম্মান করেন।]

এই বক্তব্যে, শাইখ তাদের সম্পর্কে বলছেন, যারা সব সময় শারীয়াহ ব্যতীত বিচার করে বা আইন প্রণয়ন করে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলছেন না, যারা পাপ করছে অথবা যারা ক্ষেত্রবিশেষে বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যেমনটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার সম্পূর্ণ তাফসীরে, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। এমনকি যদি তারা আংশিকভাবে শারীয়াহ দ্বারা আইন প্রণয়ন করে, তবেও তারা বড় কুফর করেছে।

আল আল্লামাহ, তাফসীর এর আলিমদের শাইখ, আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবন জারির আত-তাবারী (رَحِمَهُ اللَّهُ) নিম্নোক্ত উজ্জ্বল মন্তব্য করেছেন,

“আর যে কেউ আল্লাহর বিচারবিধান গোপন করে, যা রয়েছে তার কিতাবে এবং যাকে তিনি তার বান্দাদের মধ্যবর্তী আইন বানিয়েছেন, এরপর সে এটিকে লুকিয়ে ফেলে, এবং এটি ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে, তবে তার উদাহরণ হল ইহূদীদের ব্যাভিচারকারীর ক্ষেত্রে বিচারকার্যের ন্যায়... এবং তাদের পাথর নিক্ষেপের আয়াতকে লুকানো... এবং আল্লাহ ﷻ ইতিমধ্যেই তাদের সবাইকে তাওরাহ এর বিচারবিধানে সমান করে দিয়েছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।”
[সূরা আল-মাইদা: ৪৪]”

এই মহান আলিম অপর জায়গায় বলে চলেছেন,

“এরা হল তারা, যারা আল্লাহ ﷻ তার কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার করে না, কিন্তু তারা প্রতিস্থাপিত করে, পরিবর্তন করে এবং তার বিচারবিধানকে বিকৃত করে। তারা সত্যকে গোপন

করে, যা তিনি তার কিতাবে প্রেরণ করেছেন।”
[তাফসীর আত-তাবারী, ভলিউম: ৪, পৃষ্ঠা: ৫৯১-৫৯২]

"আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন যে, যারা মুশরিক এবং আল্লাহর ﷻ সাথে শরীককারী, তাদের কি কোন শরীক আছে তাদের শিরক ও পথভ্রষ্টতায়, যা তাদের জন্য এমন এক দ্বীন আবিষ্কার করে যার আবিষ্কার করার অনুমতি আল্লাহ দেন নি!”

[তাফসীর আত-তাবারী, ভলিউম: ১১, পৃষ্ঠা: ১৪১]

স্প্যানিশ সম্মানিত হানাফি ইমাম, আল আল্লামাহ আবূ হাইয়্যান মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ আল আন্দালুসী আল-গারনাতী (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এই আয়াতটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।"
[সূরা মায়িদায়: ৪৪]

“অর্থটি সুস্পষ্ট এবং সাধারণ এবং এটি এই উম্মাহর জন্য সর্বজনীন এবং অন্যান্যদের জন্যও যারা তাদের পূর্বে এসেছিল।”
[আল-বাহর আল-মুহিত, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ৪৯২]

আব্দুল্লাহ আযিয বিন ইয়াহিয়া আল কিনানিকে (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ), (৫:৪৪) আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “এটি আল্লাহর নাজিলকৃত সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে হলে প্রযোজ্য, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।”
[তাফসীর আল-বাগভী, মায়িদা: ৪৪]

তার সময়কার শাইখুল ইসলাম, শাইখ আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

“কুফফারদেরকে, আহলুল কিতাব (খ্রীষ্টান ও ইহূদী) এবং মুনাফিকূনরা, যাদেরকে আল্লাহ ﷻ অভিযুক্ত করেছেন, মিত্র হিসেবে গ্রহণ করার অন্যতম চিহ্ন হল কিছু কুফরভিত্তিক মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া বা তাদের আইন দ্বারা বিচার করা এবং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করা।”
[মাজমু’আতুল ফাতওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ১৯০]

ألم إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت و يقولوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগূতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত।” [সূরা আন-নিসাঃ ৫১]

[মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ১৯১]

“একজন ব্যক্তি, যাকে এমন বিষয়সমূহে আনুগত্য করা হয় যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং একজন ব্যক্তি, যাকে আনুগত্য করা হয় আল্লাহর পথনির্দেশনা ব্যতীত অপর কিছুতে, সে একটা ত্বগুত। হয় তুমি তাকে গ্রহণ কর এমন খবরে যা আল্লাহর খবরের বিরোধী, অথবা যদি তুমি তার আদেশসমূহ মেনে চল যা তার (আল্লাহর ﷻ) আদেশসমূহের বিরোধী, সে একটা তাগুত। এই কারণেই, যে ব্যক্তিটিকে মুমিনদের বিচারক হিসেবে নেওয়া হয়, এবং তার আল্লাহর আইনসমূহ ব্যতীত অপর কিছু

দিয়ে শাসন/বিচার করাকে আল্লাহর কিতাবে ত্বগুত বলা হয়েছে।”
[মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ২০১]

“এটা দ্বীন হতে অবশ্যম্ভাবীরূপে জানা যায়, এবং মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে যে, এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যারা ইসলামি শারীয়াহ-এর একটি শারীয়াহ বন্ধ করে দেয় যা প্রকাশ্য এবং কেউ এর ব্যাপারে কোন বিরোধ করে না।”
[মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ৫৫৬]

ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) শাসন/বিচার সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

“এবং তিনি (আল্লাহর ﷻ) তাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন, যে সর্বজনীন আইনের বিচার পরিত্যাগ করে, যা প্রতিটি ভাল কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার খারাপ কাজকে নিষেধ করে। আর এটাই প্রকৃত ন্যায়বিচার যার সাথে, নিছক কিছু আইডিয়া, সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও দূর্নীতি যা মানুষ আল্লাহর শারীয়াহ-এর কোন প্রতিষ্ঠিত দলীল ব্যতীত তৈরী করে, তার কোন তুলনা হয় না। ঠিক যেমন

জাহিলিয়্যাহ-এর লোকেরা তাদের পথভ্রষ্ট আইডিয়া ও অজ্ঞ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিচার করেছে, যা এসেছে তাদের নব্য আবিষ্কার, বিভিন্ন আইডিয়ার মিশ্রণ এবং সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকে, তাতাররাও তাদের রাজা চেঙ্গিস খান থেকে নেওয়া রাজকীয় রাজনীতি দ্বারা বিচার করেছে, যে (চেঙ্গিস খান) তাদের জন্য একটি সমন্বিত বই তৈরী করেছিল, যা বিভিন্ন শারীয়াহ যেমন: ইহূদীধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের বিচারবিধানের মিশ্রণে তৈরী হয়েছিল। আর এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিচার-বিধান রয়েছে যা নিছক তার ডাহা চিন্তা-ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছে। এরপর এটি তার ছেলেদের জন্য একটি অনুসরণীয় আইনে পরিণত হয়, আর তারা এটিকে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ-এর উপরে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফিরে পরিণত হয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ جل جلاله এবং তার রাসূল ﷺ এর প্রণীত আইনসমূহে ফিরে আসে। সুতরাং, তিনি (আল্লাহ ﷺ) ব্যতীত আর কারোও কোন ব্যাপারে বিচার বা আইনপ্রণয়ন করা উচিত নয়, হোক তা ছোট অথবা বড়।”

[তাফসীর ইবন কাসীর, ভলিউম: ০২, পৃষ্ঠা: ৬৭]

[ইবনু কাসিরের (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এই বিচারটি প্রকৃতপক্ষে তার সূরাহ আল-মায়িদা এর আয়াত: ৫০-এর ব্যাখ্যার পর এসেছে। যে কারণে তিনি ঠিক আয়াত: ৪০-৪৪-এর পরপরই এর উল্লেখ করেন নি, তা হল, শাইখ শুধুমাত্র একজন কমেন্টর (মন্তব্যকারী)-ই নন, বরং তিনি একজন ইসলামিক জুরিস্ট (আইনবিদ)ও। আর জুরিস্টদের পদ্ধতি হল, সেই বিষয়ের সকল আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহকে সম্পর্কিত করা, এবং সেই সাথে সেই ব্যাপারে সাহাবাগণ এর উক্তিসমূহকে পেশ করা। আর এরপর, তিনি তার উপসংহার পেশ করবেন, যা তিনি সূরা আল-মায়িদা এর আয়াত: ৫০ এর পর করেছেন।]

ইবনু কাসির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) অপর জায়গায় বলেছেন,

“যে কেউ মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ পরিত্যাগ করে, এবং অতীতের একটি শারীয়াহ এর দ্বারা শাসিত হয় (তাওরাহ, ইনজীল), মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সে একজন কাফির। তাদের ব্যাপারে কি হবে যারা কোন রহিত শারীয়াহর দ্বারা শাসিত হয় না, বরং আল-ইয়াসাক্ব, এবং সে এটাকে মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহ এর উপর প্রাধান্য দেয়? নিশ্চিতভাবে, যে কেউ এরূপ করে, সে মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে, সর্বসম্মতভাবে একজন কাফিরে পরিণত হয়।

আল্লাহ বলেন,
أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن الله حكماً لقوم يوقنون

“তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহর চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?” [সূরা মায়িদা: ৫০]

ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما

“তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়/আত্মসমর্পণ করে। [সূরা আন-নিসা: ৬৫]

আল্লাহ এই বিষয়ে সত্য কথা বলেছেন।” [আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ভলিউম: ১৩, পৃষ্ঠা: ১১৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন,

“এটা দ্বীন ইসলামের ঐকমত্য এবং মুসলিমদের হতে জানা যায় যে, যে কেউ শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অনুসরণ হতে দেয়, সে একজন কাফির। আর তার কুফরটি তার ন্যায় যে কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে, এবং কিতাবের অপর কিছু অংশে বিশ্বাস করে না।” [মাজমু'আ ফাতওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ৫২৪]

এটা ঠিক তাই, যা আমাদের আধুনিক দিনের শাসকেরা করছে। সুতরাং, কে আছে, যে মুমিনদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর ওয়াস্তে জন্য যুদ্ধ করা থেকে থামানোর চেষ্টা করবে?

শাইখ (رَحِمَهُ اللَّهُ) আমাদেরকে অপর জায়গায় আদেশ করেছেন,

“যে কেউ বিদআহ অথবা পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকছে এবং তার শয়তানি ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হয়, তবে তাকে হত্যা করতে হবে, এমনকি যদিও সে ভান করে যে, সে তাওবাহ করেছে এবং সে কাফির নয়। এটা শিয়াদের

নেতাদের ন্যায়, যারা মানুষদের পথভ্রষ্ট করে এবং এভাবে, মুসলিমরা গইলান আল-ক্বদারী, আল-জাআদ ইবন দিরহাম এবং তাদের মতদেরকে হত্যা করেছে।” [মাজমু’আ ফাতওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ৫২৮]

“জানা এবং স্পষ্ট ইসলামিক আইন থেকে, যেকোন গোষ্ঠী বা দল, যা শারীয়াহর একটি আদেশ থেকেও বিরত থাকে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, হালাল এবং এমনকি বাধ্যতামূলক।” [মাজমু'আ ফাতওয়া, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ৫৫৬]

আল আল্লামাহ আল- মুরাসসিস মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানক্বীতি (رَحِمَهُ اللَّهُ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

و إن أطعتمو هم إنكم لمشركون

“…যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।” [সূরা আল-আনআম: ১২১]

“নিশ্চয়ই এই সরাসরি আল্লাহ ﷻ থেকে একটি ফাতওয়া যে, যে কেউ শাইতন এর প্রণীতআইন এর অনুসরণ করে যা আর-রহমান এর প্রণীতআইন এর বিরোধী, সে একজন মুশরিক, আল্লাহর ﷻ সাথে শরীক করে।
[আদওয়া’ উল বাইয়ান]

এই মহান ইমাম বলেছেন যে, যারা প্রণীতআইনসমূহ অনুসরণ করেছে, তারা মুশিরকূন। এটা
স্বয়ংক্রিয়ভাবে
বিন্দুমাত্র সন্দেহ না রেখে বুঝিয়ে দেয় যে, যারা আইনপ্রণয়ন করেছ তারা আরও বড় মুশিরকূন এবং শিরক এর মূল উৎস, যা তার
অনুসারীদের পানের জন্য রিদ্দাহ এর ঝর্না প্রবাহিত করছে। এছাড়া, এর মানে আরও দাঁড়ায় যে, এরা হল শাইয়াত্বিন, যেমন তুমি তার
তাফসীরে সঠিক শব্দটি দেখতে পাও। আমরা অতিমত্রায় বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত যে, এত প্রচুর দলীল থাকা সত্বেও এমন অনেকে আছে যারা শাইতনের জন্য যুদ্ধ করছে এবং তার প্রতিরক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করছে। বিশেষভাবে, যদি তারা এরপরও এই শিরোনামে ফিরে

আসতে চায় যে, তারা হল সালাফদের সঠিকপথপ্রাপ্ত অনুসারী। নিশ্চিতভাবেই, এটা শ◌ুধুমাত্র উন্মাদ লোকদেরই উক্তি হতে পারে।

আরব উপদ্বীপসমূহের প্রাক্তন মুফতি, আল আল্লামা (দ্বীনি মতবাদে সবচাইতে জ্ঞানী আলিম), আল-মুহাদ্দিস, ফাকিহ (ইসলামি আইনবিদ), শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

[শাইখ সবকিছুর উপর কথা বলেছেন, ড্রাগস থেকে শুরু করে কিভাবে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, যারা শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করে তাদের শাস্তি এবং অন্যান্য সবকিছু। তিনি অন্যতম জিহাদের আলিম যিনি এর আহবান করেছেন এবং এর জন্য লজ্জিত ছিলেন না। তার অন্যতম ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল জিব্রিন, যিনি তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র, যিনি এখনোও শিক্ষাদান করে চলছেন (এবং সেই সাথে তার শিক্ষকের ন্যায় তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ এর উপর শিক্ষাদান করে চলছেন), তাকে উপদ্বীপসমূহের বড় আলিমদের থেকে দূরত্বে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার কিছু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম এর পুত্র, শাইখ ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ (حَفِظَهُ ٱللَّٰهُ) তার পিতার উত্তরাধিকারী এবং তার সত্যের জন্য উঠে দাঁড়ানোর জন্য বর্তমানে উপদ্বীপসমূহে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, উপদ্বীপসমূহের উলামাদের মধ্যে সকলেই শাসনব্যবস্থার কোলে রাখা কুকুরে পরিণত হন নি।]

“কুফর দুনা কুফর কথাটি সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা হয় যখন বিচারক আল্লাহর দিকে বিচারকার্য নিয়ে যায় না, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, যে এটা অবাধ্যতা। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিচার সঠিক/সত্য, কিন্তু সে একটি ব্যাপারে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু, যে কেউ ক্রমান্বয়ে আইন তৈরী করতে থাকে এবং অন্যান্যদেরকে এর প্রতি আত্মসমর্পণ করায়, তবে এটি কুফর, যদিও তারা বলে থাকে, 'আমরা পাপ করেছি এবং নাযিলকৃত আইনই অধিক সঠিক।' এটা তারপরেও কুফর, যা দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত করে।
[ফাতওয়া শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম, ভলিউম: ২১, পৃষ্ঠা: ৫৮০]

শাইখ অপর জায়গায় বিস্তৃত করেছেন,

“আর এটা (শারীয়াহ প্রতিস্থাপিত করার বড় কুফর) শারীয়াহ-এর প্রতি এর একগুঁয়ে বিরোধীতায় আরোও বেশী, আরোও সর্বজনীন, আরোও স্বতন্ত্র, এবং আরোও স্পষ্ট। আর তার বিচারের ব্যাপারে একগুঁয়েমি ও অহংকার, আল্লাহ ﷻ ও তার রাসূলের ﷺ ব্যাপারে অসাবধান হওয়া, শারীয়াহ কোর্টসমূহের সদৃশ কিছু তৈরী করা, আয়োজন করা, প্রস্তুত করা, একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োগ ও

ব্যবহারবিধি তৈরী করা, (শারীয়াহ) পরিবর্তন করার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস ও বিষয়ের একটি মিশ্রণের আকার দান করা, আকৃতি দান করা এবং সংগঠিত করা, বিচারকার্য তৈরী করা, এটিকে বাধ্যতামূলক করা, এবং কর্তৃপক্ষ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিচারকার্য করা। তাহলে ঠিক যেমন শারীয়াহ কোর্টসমূহ কর্তৃপক্ষ-এর দিকে ফিরে যায়, তাদের সকলেই আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের ﷺ সুন্নাহ-এর দিকে ফিরে আসে, তেমনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃত্বসমূহ এর (মিথ্যা বাতিল শারীয়াহ) মধ্যে যেগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেগুলো নব উদ্ভাবন এবং প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শারীয়াহ, বিভিন্ন আইনব্যবস্থা যেমন: French Law,
American Law, British Law ও অন্যান্য Law এবং অন্যান্য সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কতক বিদআহ ও অন্যান্য জিনিস শারীয়াহ-এর উপর আরোপ করা হয়েছে।

এরপর এসব আদালত আজ ইসলামের বেশীরভাগ শহরকেন্দ্রে রয়েছে, আয়োজিত, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ, দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষেরা এগুলোতে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে, একের পর এক। তাদের

শাসকেরা বিচারকেরা মানুষের মাঝে বিচার করে এমন কিছুর দ্বারা যা সুন্নাহ ও আল-কিতাবের বিচারকার্যের সরাসরি বিপরীত ও বিরোধী, সেই আইনসমূহের (বাতিল মিথ্যা শারীয়াহ) বিচারকার্য থেকে এবং তাদেরকে এতে বাধ্য করে এবং শারীয়াহ-এর উপর এটিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের উপর এটা চাপিয়ে দিয়ে এবং তাদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করে। এরপর কোন কুফর (প্রশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতার ব্যাপারে) এই কুফরের উপরে? আর এই শাহাদাহ যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি কোন বিরোধীতা এই বিরোধীতা ও সীমালঙ্ঘনের উপরে?”

[তাহকিম আল কওয়ানিন, পৃষ্ঠাঃ ০৬]

আল আল্লামাহ শাইখ হাফিয ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল-হাকামি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এই বিদআহ যা কুফর, সেটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

“যে কেউ উলামাগণ এর ইজমা বাতিল ঘোষণা করে, ফার্দ্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে, বা এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা আল্লাহ ﷻ চাপিয়ে দেন নি, অথবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে, এর মধ্যে কতক

লোক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামকে ধ্বংস করছে। এই ধরনের লোকেরা কুফফার, কোন সন্দেহ ছাড়া। এ ধরনের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু। কিছু অজ্ঞ মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে (যারা একটি ফার্দ্ব অস্বীকার করেছে) কুফফার বলা যাবে, যখন তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়ে যায়।"
[মা'আরিজুল-কাবুল বাবুল-বিদআহ মুকাফিরাহ, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ১২২৮]

শহীদ শাইখ সায়্যিদ কুতুব (رَحِمَهُ اللَّهُ) আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন,

"আল্লাহর কাছে অন্যতম প্রিয় বস্তু হল হাকিমিয়্যাহ। যে কেউ কিছু লোকের একটি গোষ্ঠীর জন্য আইন প্রণয়ন করে, সে ইলাহ হিসেবে আল্লাহর অবস্থান গ্রহণ করেছে, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করা হবে। আর সে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ তার নিজস্ব উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য ব্যবহার করছে। তারা তার দাস, আল্লাহর ﷻ দাস নয়। তারা তার দ্বীনে রয়েছে, আল্লাহর ﷻ দ্বীনে নয়। এই বিষয়টি আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এটি সবচাইতে ভয়ংকর ও সবকিছুর

চাইতে বিশাল, যখন আক্বীদাহ এর বিষয় আসে। এটি একটি উলুহিয়্যাহ (আল্লাহর ইলাহ হওয়া) এবং উবুদিয়্যাহ (আল্লাহর জন্য দাসত্ব নির্ধারণ করা) সম্পর্কিত বিষয়। এটি জাহিলী ও ইসলাম এর ব্যাপারে একটি কুফর ও ঈমান সম্পর্কিত বিষয়। জাহিলিয়্যাহ কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়, বরং একটি অবস্থা। যে কোন জাহিলিয়্যাহ-এর সময়কাল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।”
[ফী যিলাল ইল-কুরআন]

আমরা আরোও বিবেচনা করব একজন শারীয়াহ ও আল্লাহর রাস্তায় আহবানকারী ও উৎসাহদানকারীর কথা। আসুন শাইখ এর কথাগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা করি, যিনি আল-আযহার এর প্রাক্তন তাফসীর শিক্ষক, আল আল্লামাহ শাইখ উমার আব্দুর রহমান আল-মাসরী (حَفِظَهُ ٱللَّٰهُ)

“মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন/বিচার করা, যা কাফির রাষ্ট্রসমূহ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে মুসলিম ভূখন্ডসমূহে প্রয়োগ করার জন্য, বিশেষ করে এমন সব বিষয়ে, যা স্পষ্টভাবে ও বাহ্যত পরিষ্কারভাবে কিতাব ও সুন্নাহ এর শারীয়াহ এর বিরোধী, তা কোন

সন্দেহ ব্যতীত কুফর এবং পথভ্রষ্টতা। এই দলীল নিয়ে, আমরা বলছি যে, আল্লাহর আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা এবং আল্লাহর আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করা, কুফর।

ও হে বিচারক! কোর্টের প্রধান, আমি তোমাকে সত্য প্রদান করেছি এবং সত্য স্পষ্টত প্রতীয়মান। ফাজর (ভোর) এবং সুবাহ (সকাল) সকলের কাছে পরিষ্কার। তোমার অবশ্যই আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করতে হবে এবং আল্লাহর বিধি-বিধান প্রযোগ করতে হবে। যদি তুমি তা না কর তবে তুমি কাফির, যলিম এবং ফাসিক।” [কালিমাতুল-হাক্ক, পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫]

[তার লিখিত ১০ টিরও বেশী কাজ রয়েছে এবং সবচাইতে বেশী পরিচিত তার তাফসীর আয়াতুল-হাকিমিয়্যাহ, তাফসীর সূরাতুত-তাওবাহ (৪০০০ পৃষ্ঠা) এবং সূরাহ ইউসূফ, আনকাবূত ও মাআরিজ এর উপর তার অন্যান্য তাফসীরসমূহ। তাকে আজকের দিনের অল্প কয়েকজন আধুনিক মুফাস্সিরুনদের মাঝে অন্যতম একজন ধরা হয়।]

উমার আব্দুর রহমান, নাজাহ ইবরহীম, ইসামুদ্দীন আল-দারবালাহ এবং আসিম আব্দুল-মাজিদ এই

ভাইয়েরা এই যুগের মুসলিম ভূখন্ডের শাসকদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন,

“আর আজকের শাসকেরা পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি তাদের আনুগত্য স্থাপন করেছে, যাদের উভয়েই কাফির। আর ভালোবাসার সম্পূর্নাংশ দেওয়া হয়েছে ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের। এবং খাঁটি শত্রুতাসমৃদ্ধ ঘৃণা, যুদ্ধকৌশল, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা প্রয়োগ করা হচ্ছে ইসলাম ও এর মানুষের প্রতি। এবং তারা এই সময়ে আল্লাহর কিতাবের বিচার বিধান ত্যাগ করেছে। তারা পবিত্র আসমানী আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে, আর এই সবকিছুর উপরে, তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম। তাদের আরোও আছে পথভ্রষ্ট আলিম, যারা তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে খলীফাহ এবং আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ (আল্লাহর আদেশক্রমে আইনপ্রণয়ক বিচারক) শিরোনাম দিচ্ছে। যুবকদেরকে শাসকদের কাছে আনুগত্য স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শনের এবং তাদের নতুন দ্বীন Secularism এর সংবিধান দ্বারা সৃষ্টির মাঝে বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা এর খবর তৈরী করে, তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং শিশুদের মনের মাঝে এটি

প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই নতুন দ্বীনের আহবান হল, মাসজিদ হল আল্লাহর, আর শাসকেরা আইনপ্রণেতা।”
[আল-মিসহাক আল ইসলামী আল আমালী, পৃষ্ঠা: ২২, এই কাজটি ইংলিশ-এ "In Pursuit of Allah's Pleasure" নামে পরিচিত।]

ভাইয়েরা অপর জায়গায় বলছিলেন,

“আর আমরা বিচারক ও আইনপ্রণেতা হিসেবে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারোও উপর সন্তুষ্ট নই, ঠিক যেমন আমরা রব হিসেবে আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারোও উপর সন্তুষ্ট নই। এভাবে, যিনিই সৃষ্টি করেন, তবে সমস্ত কর্তৃত্ব/আধিপত্য তারই আর যিনিই মালিক, তবে তিনিই বিচার করেন, হারাম করেন, আদেশ করেন, পূর্বনির্ধারিত বিষয়াদি নির্ধারণ করেন, আইন প্রণয়ণ করেন, আর তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সকল বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ওয়াকিফহাল। এভাবে যে কেউই আল্লাহর পাশাপাশি আইন প্রণয়ণ করে, এবং আল্লাহর শারীয়াহকে অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, তবে ইতিমধ্যেই সে আল্লাহর আইনে তার বিরোধিতা করেছে। সে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে এবং নিজেকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছে এবং সে ইসলামের পরিধি ত্যাগ করেছে।

তাদের থেকে বেড়িয়ে আসা বাধ্যতামূলক এবং তারা আজকের দিনের শাসক, যারা মুরতাদ হযে গিযেছে।”
[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৬-২৭]

এই যুগের হাদিসের আলিমদের ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, আল আল্লামা শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) নিম্নের এ সকল হতবুদ্ধিকর পয়েন্টসমূহ বর্ণনা করেছেন,

“আর তারা, যাদের আইনপ্রণয়নের জন্য প্রচেষ্টা ইসলামি বিধি-বিধান অনুসারে নয়, সে একজন মুজতাহিদ বা একজন মুসলিম হবে না, যদি সে একটি আইন প্রণয়ন করতে চায়। আমরা অনেক মানুষকে দেখতে পাই, যাদেরকে মুসলিম হিসেবে আইনসমূহ প্রণয়নের বা বিচারকার্যের বা ব্যাখ্যা করার বা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, কারণ তারা সালাহ আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে, যাকাহ দিচ্ছে এবং হাজ্ব পালন করছে। তুমি তাদের ইবাদাহ-এর বিরুদ্ধে/ব্যাপারে কিছুই বলতে পারো না। কিন্তু, যখন তুমি তাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে দেখেছো, এসকল আইনসমূহ তাদের ক্বলব-এর অনেক গহীনে গিয়ে প্রবেশ করেছে, যেমন শাইতন তাদের রক্তে। তারা এ

সকল আইনসমূহের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। তারা এই সময়ে ইসলামের ব্যাপারে এবং আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে যেকোন কিছুই ভুলে যায়, এ ব্যতীত যে, তাদের মধ্যে কতক নিজেদের সাথেই চালাকি করে যে, তারা বলে, আমাদের আইনপ্রণয়নের জন্য ফিকহ ব্যবহার করতে হবে। তারা যখন আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আসে, তখন তারা অনুভব করে যে, ইসলামে আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং তারা এসকল জাহিলী আইনসমূহের ব্যাপারে খুবই কঠোর ও কড়া হয়ে থাকে।

নতুন আইনপ্রণয়নের গন্তব্য জাহান্নাম? আমি এটা আগেও বলেছি এবং সবসময় বলতে থাকব যে, এ প্রকারের মানুষ রয়েছেঃ

১। আইনপ্রণেতা

২। বিচারকমন্ডল

৩। সমর্থক/রক্ষক

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের জন্য একই হুকম (আইন) প্রযোজ্য এবং তাদের গন্তব্যও (জাহান্নাম) একই। যারা আইনপ্রণয়ন করে, সে নিশ্চিতভাবে আইনসমূহ তৈরী করে এবং সে বিশ্বাস করে যে সেগুলো সঠিক, এবং বিশ্বাস করে যে, সে যা করছে তা সঠিক। যারা আইনপ্রণয়ন করছে, তারা কুফফার, যদিও তারা সালাহ আদায় করে বা সিয়াম পালন করে। বিচারকের ক্ষেত্রে, তার পরিস্থিতির অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। তার ওজর থাকতে পারে, যদি আইনটি ইসলামিক আইনের সাথে মিলে যায়। তুমি যদি সতর্কভাবে তাকাও, এই ওজর কৈফিয়তটি দাঁড়াতে পারে না। যদি সে তা দিয়ে শাসন করে যা ইসলামের বিরোধী, তবে সে নিশ্চিতভাবে এই হাদিসটির একজন,

“যে কেউ মানুষকে হারাম কাজ করতে আদেশ করে, আমরা তার আনুগত্য করব না।” [সহীহ মুসলিম: ৩৪]

এই বিচারকের জন্য, আইনপ্রণেতার কথা শোনা ও আনুগত্য করা, অথবা তাদের রক্ষা করা যারা আল্লাহর আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে, অথবা এমন বিষয় যা ইসলামি শারীয়াহর বিরোধী,

যদি সে তা শুনে এবং আনুগত্য করে, তবে তার সেই একই পাপ ও শাস্তি হবে, যা সেসকল লোকের হবে যারা তাকে আদেশ দিয়েছিল, সে ঠিক তাদের মতই হবে। যে সকল লোকেরা আজ আইন (বাতিল শারীয়াহ) তৈরী করে, তারা আইনের (শারীয়াহ-এর) ক্ষেত্রে নব্য আবিষ্কার করেছে। যদি দুইটি আইন থাকে যা পরস্পর বিরোধী, যার মাঝে একটি ইসলামি, তবে কোর্টের সেই আইনটি (বাতিল শারীয়াহ থেকে) আইনপ্রণেতার কাছে প্রয়োগ করতে হবে, স্বাভাবিকটি (ইসলামি আইন) নয়।”

[আস-সাম ওয়াত-তা'আ পৃষ্ঠা: ১৬-১৯]

কুয়েতী শাইখ আব্দুর রাযযাক ইবনু খালীফাহ আশ-শায়িজি (حَفِظَهُ ٱللَّٰهُ) শাসন/বিচারের বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

“আর ইতিমধ্যেই সেই তথাকথিত শিক্ষিত জনদের মধ্য থেকে দাবী চলে এসেছে যে, তাওহীদ আল-হুকম (আল্লাহর বিচারকার্যের ক্ষেত্রে একত্ব) তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার করা শুধুমাত্র ‘কুফর দুনা কুফর’। যাহোক, যারা মানুষের বিচারকার্যকে আল্লাহর

বিচারকার্যের উপরে বা সমান মর্যাদা প্রাধান্য দেয়, আর যারা পাপ করে, ব্যাখ্যা করে বা একটি ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অপর কিছুর দিকে বিচারকার্য করে, এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে যে, আল্লাহর বিচারকার্যই সত্য, যার ব্যাপারে কোন বিরোধীতা থাকা উচিত নয়, তাদের মধ্যে বিশাল ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।”

[আদওয়া আলা ফিকর ইদ-দুআত ইস-সালাফিয়্যাহ ইল-জাদিদা, পৃষ্ঠা: ৪১]

শাইখ ইবনু আবি ইয আল হানাফি (رَحِمَهُ اللَّهُ) সতর্কবাণী দেন,

[তিনি ইমাম আত-তাহায়ী এর সমকালীন একজন প্রখ্যাত আলিম, এবং তিনি এই বইটির প্রথম ব্যাখ্যাকারী।]

“যাহোক, আলিমগণ সকলে একমত যে, যে কাউকে আল্লাহ ﷻ ও তার নবী ﷺ কাফির বলেছেন, আমাদের অবশ্যই তাকে কাফির বলতে হবে। আল্লাহ ﷻ তার শারীয়াহ ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসনকারী শাসককে কাফির বলেছেন এবং রাসূল ﷺ তাদেরকে কাফির বলেছেন যারা একটি আমাল করেছে, আর আমরা এমন ধরনের মানুষদেরকে

কাফির শিরোনাম দিব না, এটা যে কারোও জন্য হারাম।

তিনি বলে চলেছেন,

আর কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে মানুষদের সতর্ক থাকা উচিত, এগুলো হল যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে শাসন করা কুফর হতে পারে, যা মানুষকে ইসলামের পরিধি থেকে স্থানান্তরিত করতে পারে এবং এটা একটা বড় পাপ (কাবীরাহ) বা ছোট পাপ (সগীরাহ) হতে পারে, যেটিকেও কুফর বলা হয়...

এটা হল শাসকের পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুসারে। যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর শারীয়াহ-এর দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক নয়, এবং তার এটির একটি বিকল্প রয়েছে, অথবা এটির মর্যাদার হানি করে, যদিও সে জানে যে, এটি আল্লাহর থেকে, তবে এটি হল বড় কুফর। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, শারীয়াহ-এর দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক এবং সে ঘটনাটির সময় এটি জানে, কিন্তু সে এর থেকে বিচ্যুত

হয়ে পড়ে, এটা স্বীকার করে যে, সে শাস্তির প্রাপ্য, তবে সে অবাধ্য এবং তাকেও কাফির বলতে হবে, ছোট অর্থে।”

[ইবনু আবি আল-ইয আল-হানাফীর "শরহ আল-আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ", পৃষ্ঠা: ৩২৩]

শাইখ উসাইমিন বলেছেন,

“যদি কোন আলিম এমন শাসকের অনুসরণ করেন, যে শারীয়াহ-এর দ্বারা শাসন বিচার করে না, তবে সেই আলিম নিজেই ত্বাগুত।”
[ফিকহুল-ইবাদাত মুহাম্মাদ সলিহ আল উসাইমিন, টেপ: ০২]

শাইখ ইবন বায বলেন,

“যারা Capitalism, Communism বা অপর যে সকল ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ রয়েছে, সেগুলোর দিকে আহবান করে, তারা কুফফার, পথভ্রষ্ট এবং তাদের কুফর ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের চাইতেও খারাপ।”

[মাজমু'আ ফাতাওয়া ওয়া মাকলাতি মাতনুআ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ২৭৪]

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন আলিমগণ বলেছেন, 'ঘটনা', তখন তারা এর দ্বারা কখনোই এমন সময় বোঝান নি যখন সমগ্র শারীয়াহ অপর কোন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে পড়েছে। তারা শুধুমাত্র ভেবেছিলেন যে, কতক বিচারক হয়ত নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কোন গোপন জায়গায় ঘুষ নিয়েছিল। এটা হলো সেই প্রমাণ যে, শাসনকার্য সম্পর্কিত ছোট কুফর বিষয়ে বিশ্বস্ত আলিমদের কথা কোনভাবেই আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে মিলে না। এই বিশ্বস্ত আলিমগণ আইনপ্রণয়ন প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন না, বরং বিচারকার্যে সংঘটিত কিছু ঘটনার ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যেখানে শারীয়াহই মূল আইনব্যবস্থা রূপে বিদ্যমান ছিল, অন্য কোন বাতিল আইনব্যবস্থার প্রণয়ন হচ্ছিল না। আলিমগণ কখনোও এমন ব্যক্তির কথা বলেন নি, যে একটা বাতিল আইনব্যবস্থার দ্বারা কোন আনুগত্যের চুক্তি বা শাসনকাল লিখে প্রাসঙ্গিক শাসকের ক্ষমতার মেয়াদ পর্যন্ত। এই ধরনের ব্যক্তি কাফির, কোন ঘটনা ঘটার আগেই। আর এরাই হল সে সব লোক, যাদের

ব্যাপারে ইমাম আবু ইযয (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন যে, "তারা শাহাদাহ বলছে এবং কুফর করছে। তাই তারা একটা যিনদিক-এর শাস্তির উপযুক্ত। কারণ তারা জোড়ালোভাবে তাদের কুফর প্রকাশ করে এবং এরপর গোপন করে।"

যারা হাকিমিয়্যাহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাদের প্রতি একটি জবাব, যারা বলে যে, আল্লাহর ﷻ আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা ছোট কুফর:

যখন ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এই উক্তিটি করলেন যে, 'এটা যথেষ্ট কুফর', তখন এটাকে ছোট কুফর অর্থে বলা যায় না। যখন তিনি বলেছেন যথেষ্ট, তখন এটাকে শুধুমাত্র বড় কুফর হিসেবেই নেওয়া যায়। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ কুরআনের তাফসীর-এর বিধির মাঝে নিহিত।

আল-আল্লামা, এই যুগের মহান মুহাদ্দিস, আহমাদ শাকির (رَحِمَهُ اللَّهُ) বড় কুফর এবং ছোট কুফর এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন, যার শেষাংশটি খুবই কঠোর,

“এটা আবু মাজলিয (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর কথাসমূহ থেকে। যখন ইবাদিয়্যাহ (খাওয়ারিজ)-রা তাকে আয়াতটির অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যেহেতু তারা আলী (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর দল কে তাকফীর করতে চাইছিল। তখন আবু মাজলিয (رَحِمَهُ اللَّهُ) বললেন যে, তারা যা করে তা করে এবং জেনে রাখো যে এটা একটা পাপ। আবু মাজলিয (رَحِمَهُ اللَّهُ) ও ইবন আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কাছে তাদের প্রশ্ন আমাদের সময়কার সে সকল লোকদের বিদআহ এর ন্যায় নয়, যারা আইনপ্রণয়ন, বিচারকার্য ইত্যাদিতে কাজ করছে অথবা জান, মাল ও ইযযাত এর ক্ষেত্রে এমন আইন দ্বারা বিচার করছে যা শারীয়াহ-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাদের বিদআহ মানুষকে মানুষের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের আবেদনস্বরূপ ছিল না, তাদেরকে আল্লাহ ﷻ ও তার রাসূল ﷺ এর শারীয়াহ ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে শাসিত হবার জন্য বাধ্য করার স্বরূপ ছিল না। এই ধরনের আমল হলো, তাদের জন্য আল্লাহর ﷻ বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর ﷻ দ্বীনকে পরিত্যাগ করা, যারা আল্লাহর ﷻ তুলনায় অধম। মাক্কাহর দিকে সালাহ আদায়কারী কোন মানুষের এই ধরনের কুফর সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর তারা যেখানেই বাস করে না কেন, তা সার্বজনীনভাবে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া আল্লাহর ﷻ আইন ত্যাগ করছে। তারা তার বিধিসমূহ, যা তার কিতাব এবং সুন্নাহ-এ নাযিল করা হয়েছিল, তা অপেক্ষা অপর কিছুকে অধিকতর শ্রেয় মনে করে এবং তারা সম্পূর্ণ শারীয়াহকে বাতিল ঘোষণা করে।

যে কেউ ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ও আবূ মাজলিয (رَحِمَهُ اللَّهُ) এর শব্দাবলিকে দলীলস্বরূপ তাদের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বলে, এই আশা করে যে, সে নিজেকে শাসকদের মিত্রে পরিণত করবে অথবা আল্লাহর আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করে, তবে তার ক্ষেত্রে শারীয়াহ অনুসারে বিধি হল, সে হলো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর ﷻ বিধিকে অস্বীকার করে। তাকে অবশ্যই তাওবাহ ঘোষণা করতে হবে। যদি সে হ্যা বলে, এতে প্রমাণ হয় যে, এটা একটা ছোট কুফর। যদি সে এই উক্তির উপর জোর পীড়াপীড়ি করে এবং তাওবাহ না করে এবং এই বিধিসমূহ (আল্লাহর আইন ব্যতীত অপর কোন কিছু) গ্রহণ করে, তবে একটা কাফির, যে তার কুফরের উপর জোর পীড়াপীড়ি

করে, তার সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত, তা সকলেরই জানা আছে।”
[তাখরীজ আত-তাবারি, ভলিউমঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৩৪১-৩৫৮]

আরব উপদ্বীপসমূহের প্রাক্তন মুফতি, আল আল্লামা, আল-মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رَحِمَهُ اللَّهُ) নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"‘কুফর দুনা কুফর’ কথাটি সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা হয় যখন বিচারক আল্লাহর দিকে বিচারকার্য নিয়ে যায় না, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, যে এটা অবাধ্যতা। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিচার সঠিক/সত্য, কিন্তু সে একটি ব্যাপারে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু, যে কেউ ক্রমান্বয়ে আইন তৈরী করতে থাকে এবং অন্যান্যদেরকে এর প্রতি আত্মসমর্পণ করায়, তবে এটি কুফর, যদিও তারা বলে থাকে, 'আমরা পাপ করেছি এবং নাযিলকৃত আইনই অধিক ন্যায়/সঠিক। এটা তারপরেও কুফর, যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।”
[ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরহীম, ভলিউমঃ ২১, পৃষ্ঠা: ৫৮০]

মহান স্প্যানিশ আলিম, ইমাম আল-আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলী ইবন-আহমাদ ইবন-সাঈদ ইবন-হাযম

আয-যাহিরি (رَحِمَهُ اللَّهُ), যারা আল্লাহর বিচারবিধান ত্যাগ করে তাদের বিষয়ে, এবং এই কাজের অপরাধের বিশালতার বিষয়ে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন,

"আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা আল-মায়িদা: ০৩]

আল্লাহ ﷻ আরোও বলেছেন,

و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين

“আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনোও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না;

আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলি-ইমরান: ৮৫]

যে কেউ দাবী করে যে, এমনকিছু যা রাসূল ﷺ এর সময়ে ছিল তা এখন আর বিচারবিধান নয়, এবং এটি তার মৃত্যুর পর পরিবর্তিত হয়েছে, তবে ইতিমধ্যেই সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন পছন্দ করে নিয়েছে। এটা এই বাস্তবতার জন্য যে, সেসকল ইবাদাত প্রক্রিয়াসমূহ, বিচারবিধানসমূহ, সেসকল বিষয়াদি যা হারাম হিসেবে আইন করা হয়েছে, সেসকল বিষয়াদি যা হালাল হিসেবে আইন করা হয়েছে, দ্বীনের মধ্যে অবশ্য করণীয় বিষয়াদি যা তার (মুহাম্মাদ ﷺ) সময়ে ছিল, সেগুলোই ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

সুতরাং, যে কেউ এর (ইসলাম) থেকে যে কোন কিছু পরিত্যাগ করে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ত্যাগ করেছে। আর যে কেউ সেটা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলেছে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ جل جلاله আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি

(আল্লাহ ﷻ) ইতঃপূর্বেই এটা (ইসলাম) কে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

আর যে কেউ দাবী করে যে, কুরআন-থেকে কোন কিছু বা বিশ্বস্ত কোন হাদিস রহিত এবং সে কোন দলীল পেশ না করে, অথবা সেই শব্দাবলি নিয়ে না আসে যা অপরটিকে স্থগিত রহিত করেছে, তবে সে আল্লাহ ﷻ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী এবং সে শারীয়াহ পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান করছে, সুতরাং ইতিমধ্যেই সে ইবলিস এর দাওয়াহ এর দিকে ডাকছে এবং আল্লাহর ﷻ রাস্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, আমরা আল্লাহর ﷻ কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظين

“নিশ্চয়ই আমি স্মরণিকা নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হিফাযাতকারী।”
[সূরা আল-হিজর: ০১]

সুতরাং, যে কেউ দাবী করে যে, এটি রহিত হয়ে গিয়েছে, তবে সে ইতিমধ্যেই তার রবের উপর একটি

মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে দাবী করেছে যে, আল্লাহর ﷻ দ্বারা এই (যিকর) স্মরণিকাটি নাযিল হবার পর তিনি সেটা সংরক্ষণ করেন নি।"
[আল ইহকাম ফী উসূল ইল-ইহকাম, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১]

মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার করা কুফর*:*

যে প্রকাশ্যে আল্লাহর দেওয়া শরিয়াহ পরিত্যাগ করে, অন্য শরিয়াহ বা সংবিধান গ্রহণ করে, অথবা সংবিধান প্রণয়ন করে ও বিচারকার্য পরিচালনা করে, সে ব্যক্তি এমন কুফরে লিপ্ত, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।
কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন, "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা নিসা: ৬৫]

তাছাড়া এমন ব্যক্তির মধ্যে কুফর বিত তাগুত নেই, অথচ এর অনুপস্থিতি ঈমানকে বাতিল করে দেয়!

আল্লাহ ﷻ বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" [সূরা আন নিসা: ৬০]

এমনকি তারা অনেকে তো নিজেরাই তাগুতে পরিণত হয়েছে; তারা মানুষের জন্য এমন আইন-কানুন তৈরি করছে যার অনুমতি আল্লাহ ﷻ দেননি।
আল্লাহ ﷻ বলেন, "..বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহরই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে.." [সূরা ইউসুফ: ৪০]

শাসনকার্য/বিচারকার্যের উৎস হিসেবে মানবরচিত শরিয়াহ গ্রহণকারীর বিধান*:*

---------------------------------------------------

▪শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন:

نُسَخُ هَذِهِ التَّوْرَاةِ مُبَدَّلَةٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَا فِيهَا وَمَنْ عَمِلَ الْيَوْمَ بِشَرَائِعِهَا الْمُبَدَّلَةِ وَالْمَنْسُوخَةِ فَهُوَ كَافِرٌ

[(كتاب مجموع الفتاوى,35:200)]
https://shamela.ws/book/7289/16643

"(বর্তমানে) এই তাওরাতের পান্ডুলিপি গুলো পরিবর্তিত, এর বিধান অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। যারাই আজ এই পরিবর্তিত ও বাতিল শরিয়াহ অনুযায়ী আমল করবে তারাই কাফির।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/২০০]

- তিনি (رَحِمَهُ اللَّهُ) আরো বলেন,

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“আর যখন কোনো আলিম কুরআন-সুন্নাহ হতে অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং আল্লাহ ﷻ ও রাসূলের ﷺ আইন বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারী শাসক/বিচারকের অনুসরণ করে,

তখন সে একজন মুরতাদ ও কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।”
[মাজমু আল ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫, পৃষ্ঠা: ৩৭২-৩৭৩]

▪ইমাম ইবনু হাযম (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,
وهذا لا حجة لهم فيه لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام

“মুসলিমদের মধ্যে দুজনের মধ্যেও কোনো মতবিরোধ নেই যে, এটি মানসুখ হয়ে গেছে এবং যে বিষয়ে ইসলামি শরিয়াহর কোন দালিল (কুরআন-সুন্নাহর নুসুস) নেই এমন বিষয়েও যদি কেউ (তাওরাত কিংবা) ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির মুশরিক, দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ। (মুরতাদ)

(كتاب الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم) (١٧٣/٥)
https://shamela(ডট)ws/book/10432/864

▪ইমাম ইবনু কাসির (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

" فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر

13/139) "البداية والنهاية" انتهى من).
https://islamqa.info/ar/answers/118135/

"কেউ যদি খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারিয়াহ ছেড়ে, পূর্ববর্তী রহিত কোনো শারিয়াহ অনুযায়ী বিচার করে, তবে সে কুফরি করলো।"
[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১৩৯]

◽ শাসনকার্য বা বিচারকার্যের উৎস হিসেবে তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল-কে গ্রহণ করলে কেউ যদি কাফির বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে বিধান কি হবে যে, শাসনকার্য/বিচারকার্যের উৎস হিসেবে এমন শরিয়াহকে গ্রহণ করেছে যে শরিয়াহতে- সুদ হালাল, ব্যভিচার হালাল,Democracy, Secularism হালাল, হুদুদ-কিসাস হারাম, ইসলাম ত্যাগ করা ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং যে

"শরীয়াহ" বাতিল হওয়ার ব্যপারে কোনো সন্দেহ নেই**?**

সুতরাং যে এই কাজটি করবে সে কুফরে আকবরে লিপ্ত হবে। আর কুফরে আকবর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে "কাফির" বানিয়ে দেয়, যদিও সে দাবী করে তার বিশ্বাসে কোনো কুফরী নেই।

◾ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, উসুলি, ফাক্বিহ, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ﷻ পরিবর্তে অন্য কারো তাহলিল (হারামকে হালাল), তাশরিঈ (আইন) অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে আল্লাহর ﷻ পরিবর্তে তাকে রব ﷻ হিসেবে গ্রহণ করল। আর সে ব্যক্তি আসমান ও জমিনের স্রষ্টার সাথে শিরককারী-মুশরিক। কেননা আল্লাহর ﷻ আইন বিধানের ক্ষেত্রে শিরক করা, তার ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক করার অনুরূপ!”

«وَمَنْ أَرَادَ أن يتبعَ تَحْلِيلاً وَتَشْرِيعًا لغيرِه فقد اتَّخَذَ غيرَه رَبًّا، وهو مشركٌ بخالقِ السماواتِ والأرضِ؛ لأَنَّ الشركَ به في حكمِه كالشركِ به في عبادتِه.»
[আযবুন নুমাইর: ২/৭৫ ]

তিনি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) আরো বলেন,

"যারা মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে, যা শয়তান তার বন্ধুদের জবানে প্রণয়ন করেছে, তার বিপরীতে যা আল্লাহ عز وجل তার রাসূলদের عليهم السلام জবানে প্রণয়ন করেছেন, তাদের কুফর ও শিরকের ব্যপারে কেউ সন্দেহ করে না, সে ব্যতীত যার অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ﷻ মুছে দিয়েছেন এবং তাদের মতো ওহির আলো থেকে অন্ধ করে রেখেছেন।"
[আদওয়াউল বায়ান, ৩:২৫৯]

◾ শাইখ সালিহ আলুশ শাইখ বলেন:

আর প্রথম দিকটি হলো (মানবরচিত) আইন, যা এই উম্মাহর ঔপনিবেশিকতার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে , এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ইসলামি শারিয়াহ সেই কাফিরদের আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তা

ফরাসি, ব্রিটিশ বা আমেরিকান আইন থেকে হোক বা তাদের অনুরূপ।
কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, ইসলামি শারিয়াহ দ্বারা বিচার করা হয় না। অর্থাৎ (মানবরচিত) আইনগুলোই শাসনকার্যের উৎস (আসল)। ইসলামি শারিয়াহ-এর ক্ষেত্রে, দেশগুলোতে এটি নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ছাড়া শাসিত হয় না। এবং এটি (ইসলামী) শারিয়াহ-কে (কাফিরদের) শারীয়াহর দ্বারা প্রতিস্থাপন (استبدال), যা কুফর আল-আকবর।
এবং আমরা আল্লাহর ﷻ কাছে আশ্রয় চাই…

https://youtu.be/rz1Nu8yxb3w?si=GIQrP0h7Xd9KG4nn

***Note:*** শাসনকার্য/বিচারকার্যের উৎস হিসেবে ইসলামী শরিয়াহ-কে গ্রহণ করার পর, শাসক যদি কোনো জুলুম করে অথবা কোনো বিচারক যদি কুপ্রবৃত্তি অনুগামী হয়ে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার না করে- তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ছোট কুফরী হবে। আর এর পক্ষে সালাফদের থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য উলামাদের বক্তব্য বিদ্যমান।

২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন:

“আর ‘কুফর-বিত-তাগুত’ এর বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা, তা পরিত্যাগ করা, ঘৃণা করা, (তাগুত)-এর লোকদের ‘তাকফির’ করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।

[কিছু কথা বলার পর বলেন]

তাগুতদের সংখ্যা অনেক এবং তাদের প্রধান পাঁচটি।

[কিছু কথার পর বলেন]

<u>দ্বিতীয়:</u> জালিম শাসক, যে আল্লাহর ﷻ হুকুম (বিধান/আইন) পরিবর্তন করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী: “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।” [সূরা আন-নিসা: আয়াত ৬০]

তৃতীয়: যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন/বিচার করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী: “আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।” [সূরা আল-মায়িদা: আয়াত ৪৪]
[আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ; ১/১৬১-১৬৩]

অন্য জায়গায় শাইখ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

“তাগুতদের সাথে কুফরি করো, তাদের সাথে শত্রুতা করো, তাদেরকে ঘৃণা করো, এবং তাকে ঘৃণা করো যে তাদের ভালবাসে বা তাদের পক্ষে তর্ক করে বা তাদের ‘তাকফির’ করে না।”

[كتاب مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول), ٣٦٨]

শাইখুল ইসলাম তাগুতদের এবং তাদের অনুসারীদের তাকফির করার জন্য বলছেন এবং যারা তাগুতদের তাকফির করে না- তাদের ঘৃণা করার জন্যও বলছেন।
আর সেই তাগুতদের মধ্যে ‘প্রধান তাগুত’ হিসেবে যাদের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে ২য় হলো ‘জালিম শাসক, যে আল্লাহর ﷻ হুকুম (বিধান/আইন) পরিবর্তন করে’ ও ৩য় হলো ‘যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন/বিচার করে।’

৩) তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া। শাইখ আব্দুল আজিজ আল রাজিহী (حَفِظَهُ ٱللَّٰهُ) এর বক্তব্য:

সূরা আন-নিসায় আল্লাহ ﷻ বলেন,

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:٦٥]

“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে

ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।” [আন-নিসা: ৬৫]

এই আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করে না, সে মুমিন নয়। আর এ জন্য আল্লাহ ﷻ তার মহিমান্বিত সত্তার শপথ করেছেন। কিন্তু না, আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না... [আন-নিসা: ৬৫] তিনি তাদের থেকে ঈমানকে অস্বীকার করেছেন যতক্ষণ না তাদের মধ্যে এ লক্ষ্য পাওয়া যায় হয়, আর তা হলো: "তারা তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে" [সূরা নিসা: ৬৫]; এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূল ﷺ -কে। "তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে" [সূরা আন-নিসা: ৬৫], অর্থাৎ: যতক্ষণ না তারা রাসূলকে ﷺ তাদের মতবিরোধ এবং যেসব বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। এটি হলো প্রথম বিষয়।

তারপর আল্লাহ ﷻ বলেছেন: "তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে" [সূরা আন-নিসা: ৬৫]। অর্থাৎ: বিচার চাওয়াই যথেষ্ট নয়, যদি আল্লাহর বিধান এবং রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিধা থাকে, বরং আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ ﷻ বলেন: "এবং মেনে নেয়" অর্থাৎ: আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক, যা হলো অন্তরের প্রশান্তি। কিন্তু এটি যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তা পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ হয়। এজন্য আল্লাহ ﷻ মাসদার ব্যবহার করে জোর দিয়েছেন, তার বাণীতে: "এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা: ৬৫]

অতএব: আল্লাহ ﷻ তার মহিমান্বিত সত্তার শপথ করে বলেছেন যে, এই চারটি বিষয়ের মাধ্যমে ছাড়া তাদের জন্য ঈমান অর্জিত হবে না:

<u>প্রথমত:</u> বিরোধ এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা।

<u>দ্বিতীয়ত:</u> এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা।
<u>তৃতীয়ত:</u> স্বস্তি থাকা।
<u>চতুর্থত:</u> পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি থাকা।

আর এটা কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করার গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

[শাইখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ রাজিহী (حَفِظَهُ ٱللَّٰهُ)
[شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية -
[(5:3-4)]

৪) ইমাম আশ শানক্বিতীর (رَحِمَهُ اللَّٰهُ) তাফসীর:

"আল্লাহর বাণী: "তিনি (আল্লাহ) তার হুকুমে কাউকে শরীক করেন না।" [সূরা আল কাহাফ; ২৬]

"বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহরই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে.." [সূরা ইউসুফ: ৪০]
এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
"হুকুমের মালিক তো আল্লাহই। আমি তারই উপর নির্ভর করি.." [সূরা ইউসুফ: ৬৭]

এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন—তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে।..” [সূরা শূরা, ৪২:১০]
এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“এটা এজন্যে যে, যখন একমাত্র আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা কুফরী করতে, আর যখন তার সাথে শির্ক করা হত তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই।” [সূরা গাফির; ১২]
এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“আল্লাহর সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তারই এবং তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।..” [সূরা আল কাসাস; ৮৮]
এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তারই; বিধান তারই; আর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আল কাসাস; ৭০]
এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান

প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?” [সূরা আল মায়িদা; ৫০]

এবং আল্লাহর ﷻ বাণী:
“(বলুন) তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন!..” [সূরা আন'আম; ১১৪]
এছাড়াও অন্যান্য আয়াতে রয়েছে।

এই আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায়, যেমন আল্লাহর ﷻ বাণী: "তিনি তার হুকুমে কাউকে অংশীদার করেন না" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত ২৬], যারা আল্লাহর প্রণয়ন করা বিধান ব্যতীত অন্য আইন প্রণেতাদের বিধান অনুসরণ করে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে। এই বুঝ অন্যান্য আয়াতেও স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন শয়তানের আইন অনুসরণকারীদের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতা দেয় এই দাবি করে যে এটি আল্লাহর যবাই, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: "আর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেও না; এবং নিশ্চয় তা গর্হিত। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে

তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।" [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১]

আল্লাহ ﷻ স্পষ্ট করেছেন যে তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে তারা মুশরিক হয়েছে। এটি আনুগত্যে শিরক। আল্লাহ ﷻ যে শরীয়াহ প্রণয়ন করেছেন তার বিপরীত আইন অনুসরণ করা- আল্লাহর ﷻ এ বাণীতে শয়তানের ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য, “হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬০-৬১]

এবং ইব্রাহিম عليه وسلم সম্পর্কে আল্লাহর বাণী (তিনি বলেন): “হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।” [সূরা মারইয়াম; ৪৪] এবং আল্লাহ ﷻ বলেন: "তার পরিবর্তে তারা নারীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে" [সূরা আন-নিসা; ১১৭]

অর্থাৎ তারা শয়তান ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করে না, অর্থাৎ তা হয় তার বিধান অনুসরণের মাধ্যমে, এবং এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অংশীদার বলেছেন, যাদেরকে অনুসরণ করা হয় সেই গুনাহসমূহে, যা তারা তাদের জন্য সুসজ্জিত করেছে, তার বাণীতে, "আর এভাবে তাদের শরীকরা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করেছে.." [সূরা আল-আনআম; ১৩৭]

নবী মুহাম্মাদ ﷺ আদি ইবন হাতিম (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন, যখন তিনি এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন:
“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদের কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে..” [সূরা তাওবা, ৯:৩১]

তখন তিনি তার জন্য ব্যাখ্যা করে দেন যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করেছে এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তাদের জন্য হারাম করেছে, আর তারা এতে তাদের অনুসরণ করেছে। আর এটিই তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে স্পষ্ট দলিলগুলোর মধ্যে হলো: আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا সূরা আন-নিসা তে ব্যাখ্যা করেছেন, যারা আল্লাহর প্রণীত শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছুর কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, তাদের (এ) দাবির প্রতি আল্লাহ ﷻ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, যে তারা মুমিন(!)। কেননা তাদের এই ঈমানের দাবি, সাথে সাথে তাগুতের প্রতি বিচারপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা এমন এক মিথ্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছেছে যা বিস্ময়কর। এবং এটা রয়েছে আল্লাহর ﷻ বাণীতে,"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" [সূরা আন-নিসা; ৬০]

৫) শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু জিব্রীন (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এর বক্তব্য:

আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সাবেক সদস্য, আশ-শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু জিব্রীন (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

সূরা মায়িদার আয়াতসমূহ:
"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।" [আয়াত:৪৪]
"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।" [আয়াত:৪৫]
"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।" [আয়াত:৪৭]
এই আয়াতগুলোতে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না:- আল্লাহর বিধান, আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর আইনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং এর কোনোটি দিয়েও বিচার করে না, সুতরাং তাদের বিধান হলো, তারা কাফির, ফাসিক এবং যালিম।
তবে যারা নিজেদের জন্য আইন তৈরি করে এবং এসব আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়: তারা আল্লাহর শরিয়াহর কিছু অংশ পরিবর্তন করেছে, যদিও পুরোপুরি পরিবর্তন করেনি, এবং তারা এসব আইন দ্বারা বিচার করে। সুতরাং আমরা বলি, এই কারণে তারাও কাফির।

যদি তারা বলে, উদাহরণস্বরূপ, আইন: ব্যভিচারকে বৈধ করে যদি দুই পক্ষের মধ্যে সম্মতি থাকে; কারণ

তাদের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নেই, সে তার ইচ্ছায় নিজেকে সোপর্দ করেছে, তাহলে কিভাবে এই কাজটি হারাম হবে? আইন: মদ্যপানকে বৈধ করে; কারণ এটি একটি সুস্বাদু পানীয় যা মানুষের মনোরঞ্জন করে, তাহলে কিভাবে আমরা তা হারাম করি? আইন: কিসাস নিষিদ্ধ করে, খুনিদের জন্য কিসাস; কারণ যদি আমাদের জনগণের মধ্যে একজন খুন হয়, এবং আমরা খুনিকে হত্যা করি, তাহলে আমাদের জনগণ থেকে একজনকে হ্রাস করার পরিবর্তে, দুইজনকে হ্রাস করা হচ্ছে!

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলি: এই লোকেরাও কাফির কারণ তারা আল্লাহর শরীয়াহর বিরোধীতা করেছে এবং অন্য আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছে।

৬) শাইখ আব্দুল রাজ্জাক আল আফিফী এর বক্তব্য:

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল আফিফী (رَحِمَهُ اللَّٰهُ) বলেন,

“ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি, (ইসলাম)-এর বিধিবিধান সম্পর্কে জানে, তারপর সে মানুষের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করে, তাদের জন্য (এমন) ব্যবস্থা

প্রস্তুত করে যাতে তারা এ অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং এর দ্বারা বিচার করতে পারে, যদিও সে জানে যে এটা ইসলামের বিধানের বিপরীত; তবে সে ইসলাম বহির্ভূত কাফির। এবং একই বিধান সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে এমন এক বা একাধিক কমিটি গঠনের আদেশ দেয় এবং যে মানুষকে এই আইন-কানুন এবং ব্যবস্থার কাছে বিচার চাইতে আদেশ দেয় অথবা এর কাছে বিচার চাইতে চাপ প্রয়োগ করে, আর সে জানে যে এটি ইসলামী শরীয়াহর বিরোধী। একইভাবে যে এটি দ্বারা শাসন করে এবং বিচারকার্যে প্রয়োগ করে এবং যে স্বেচ্ছায় এর কাছে বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে যখন তারা জানে যে এটি ইসলামের বিপরীত, তবে তারা সকলেই আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার।

http://saaid.org/Minute/mm34.htm

ইমাম মুহাম্মদ আল আমিন আশ শানক্বিতী (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

হে ভাইয়েরা, আল্লাহর সাথে হুকুম (বিচার/শাসন)-এ শরীক করা এবং তার ইবাদতে শরীক করা, অর্থের দিক দিয়ে উভয়ে একই।

যে অনুসরণ করে- আল্লাহর নিজাম (ব্যবস্থা) ব্যতীত অন্য কোনো নিজামের (ব্যবস্থার) এবং আল্লাহ যেই আইন প্রণয়ন করেছেন তা ব্যতীত অন্য আইন, উভয়ের মাঝে মোটেও পার্থক্য নেই। যে এমনটা করে এবং যে মূর্তি পূজা করে বা মূর্তিকে সিজদা করে, তাদের মধ্যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই পার্থক্য নেই তারা একই। এবং আল্লাহ শরীয়াহ বিরোধী আইন-কানুন, যা মানুষদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, আসমানী নূর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যা আল্লাহ ﷻ তার রাসূলের ﷺ উপর নাযিল করেছেন। (আর) আল্লাহর ইবাদতে তার সাথে শিরক করা এবং তার হুকুম (বিচার/শাসন) এ শিরক করা, উভয়েই একই। উভয়েই আল্লাহর সাথে শিরককারী মুশরিক। এ আল্লাহর সাথে তার ইবাদতে শিরক করে, আর এ আল্লাহর সাথে তার হুকুমে শিরক করে।

"কুফর দুনা কুফর" এর ভুল প্রয়োগ:

"কুফর দুনা কুফর" যেখানে প্রযোজ্য নয়- শাইখ আব্দুল্লাহ আল গুনাইমান (حَفِظَهُ ٱللَّهُ):

ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ), আল্লাহর ﷻ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির" [৫:৪৪]

তিনি বলেন, "এটা ঐ কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারিজীরা) গিয়েছে" এবং তাওউস (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন: ইবনে আব্বাসকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন: "এটি কুফর, এবং এটি ঐ কুফরের মত নয় যে আল্লাহ, তার মালাইকা, তার কিতাব এবং তার রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে।"

এবং তিনি আরো বলেন, "এটা ঐ কুফর নয়, যা কাউকে মিল্লাতুল ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।"

এবং সুফিয়ান ইবনু আবী জুরাইজ, আতা থেকে বলেছেন: "কুফর যা (বড়) কুফর থেকে ছোট, এবং জুলুম যা (বড়) জুলুম চেয়ে ছোট, এবং ফিসক যা (বড়) ফিসক চেয়ে ছোট।"

শাইখ: ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে যা (কুফর দুনা কুফর) বর্ণিত হয়েছে, এটা আয়াতটির সাধারণ অর্থ নয়, যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,"...তারাই কাফির।" [৫:৪৪]

এটা সম্ভব না যে আল্লাহ ﷻ কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা দেবেন আর আমরা তারপর বলবো, “না এটা কুফর না।” ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর উক্তিটি ব্যবহার করা যায় বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, যখন শাসক বা বিচারক আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে। কিন্তু সে শারীয়াহকে স্বীকার করে, এবং এও স্বীকার করে যে শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করে সে ভুল করেছে এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। এ ধরণের ব্যক্তির ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেছেন তার কুফর হল “কুফর দুনা কুফর”। কিন্তু যখন কেউ ইসলামী শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করে (অন্য) আইন দিয়ে, কিংবা সে শারীয়াহর উপর অন্য কোন বিধানকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়- তখন তার ব্যাপারে ‘কুফর দুনা কুফর’ বলা অসম্ভব। কারণ

প্রকৃত পক্ষে তার কুফর হল সেই পর্যায়ের কুফর যার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন –"তারাই কাফির।"

এছাড়া এর আগে আমরা সূরা নিসার এ আয়াতের কথা আলোচনা করেছি যেখানে আল্লাহ ﷻ তাদের উল্লেখ করেছেন যারা মিথ্যাভাবে মুহাম্মাদের ﷺ উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি ইমান আনার দাবি করে, অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাদের তাগুতের কাছে  বিচার চাওয়ার ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কিভাবে এই ইচ্ছা তাদেরকে ঈমান থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

তারপর আল্লাহ ﷻ এসব লোকের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এবং তারপর বলেছেন –

"অতএব, আপনার রাব্বের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে গ্রহণ না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [আন-নিসা, ৬৫]

এই আয়াতের শারীয়াহর দ্বারা বিচারের ব্যাপারে কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে: আল ইনক্বিয়াদ [আনুগত্য প্রদর্শন], আর-রিদ্বা [অন্তরে সন্তুষ্টি] এবং তাসলীম [সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন] করা শারীয়াহর বিচারের প্রতি। যদি এই শর্তগুলোর কোন একটি কারো মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না। তাহলে যে শাসন করছে (শরীয়াহ বিরোধী) আইন দিয়ে, তার ব্যাপারে কিভাবে বলা যাবে এটা 'কুফর দুনা কুফর?' এটা সম্ভবই না যে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এরকম বলেছেন এবং কোন আলিম যে আল্লাহ যা বলছেন ও তার নাবী ﷺ যা বলেছেন তা অনুধাবনে সমর্থ হয়েছে সে এরকম বলতে পারে না।

বরং ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর এই উক্তি প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে। কোন ব্যক্তি যদি ২-১ টি, বা এরকম সংখ্যক কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার করা থেকে বিরত থাকে, এবং সে বলে, এটি সে করেছে দুনিয়াবী লোভ কিংবা প্রমোশন কিংবা চাকরি হারানো ভয়ে, এবং সে বলে, "এটা আমার মাধ্যম যা থেকে আমি খাই।" যা এর মতো -সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে তা কুফর দুনা কুফর (কুফর, যা কুফর আকবর না)।

"কুফর দুনা কুফর" কি ইবনে আব্বাস (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ) থেকে প্রমাণিত? মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আস সা'দ (حَفِظَهُ ٱللَّهُ):

প্রশ্ন: হাকিম তার মুস্তাদরাক-এ হিশাম ইবন হুজাইর হতে, যিনি তাউস হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: 'কুফর দুনা কুফর'। কতক আহলুল ইলম এটিকে দুর্বল বলেছেন।

যদিও ইবন জারীর তাবারী (رَحِمَهُ ٱللَّهُ) তার তাফসিরে বর্ণনা করেন যে, সাওরী বলেন, ইবন জুরাইজ হতে, তিনি আত্বা থেকে, তিনি বলেছেন: 'কুফর যা (বড়) কুফর থেকে ছোট, এবং জুলুম যা (বড়) জুলুম চেয়ে ছোট, এবং ফিসক যা (বড়) ফিসক চেয়ে ছোট'।

এবং ওকী' থেকে বর্ণিত, সাঈদ আল-মাক্কী থেকে, তাউস থেকে, যে, তিনি বলেছেন: 'এটি সেই কুফর নয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।' এবং এগুলো সবই আল্লাহর বাণী 'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে

অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির' [সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৪] এর তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে।

তাই অনুগ্রহ করে এই বক্তব্যগুলোর সনদের বিষয়ে আমাদের অবগত করুন।

উত্তর: "কুফর দুনা কুফর" - এটি ইবনু আব্বাসের ছাত্রদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যেমন আত্বা এবং অন্যান্যদের থেকে। আর ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: 'এটা ঐ কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারিজীরা) গিয়েছে', এবং আরেকটি বর্ণনায়, (তিনি বলেছেন): 'এটি কুফর'।

আর হিশাম ইবন হুজাইরের কিছু দুর্বলতা আছে। হিশাম ইবন হুজাইরের কিছু দুর্বলতা আছে। না'আম। এবং ইবনু মাসউদ থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে, ইবনু জারীর তাবারী এটিও বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 'এটি আল-কুফর,' (অর্থাৎ কুফর আল-আকবর)

এবং যখন তাকে বিচারে রিশওয়াহ (ঘুষ) গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন: 'এটি কুফর।'

না'আম। ইবনু জারির আত তাবারী এই বিষয়ে সালাফদের মাঝে ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন।”

আর এটা (কুফর দুনা কুফর) কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় যারা সৃষ্টিকর্তার শরীয়াহকে উপেক্ষা করে।

তাই আল্লাহ ﷻ তার পবিত্র সত্বার কসম করে বলেছেন, যে তার শরীয়াহ ও দ্বীন-এর নিকটে বিচার চায় না, সে মুমিন নয়।

"কুফর দুনা কুফর" এর ভুল প্রয়োগ:

১) ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর বক্তব্য "কুফর দুনা কুফর" এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আল্লাহ ﷻ শরীয়াহ দ্বারা শাসন করে। কিন্তু কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী আল্লাহ ﷻ এর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না।

২) যে ব্যক্তি আল্লাহর শারিয়াহ বিরোধী সংবিধান প্রণয়ন করে এবং উক্ত সংবিধানকে শাসনকার্য বা বিচার কার্যের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করে এবং

আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে গ্রহণ করেনা- এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘কুফর দুনা কুফর’ বলা অসম্ভব। কেননা কিতাবুল্লাহ এবং আলিমদের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট, এটি কুফর আল-আকবর।

আরো বলা হয়েছে, "এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে যে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফাইসালা রজ্জু করে। এখানে এটাই হচ্ছে 'তাগুত' এর ভাবার্থ...."

তাছাড়া তারা এই কুফরী সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলে ঘোষনা দেয় এবং জনগণকে তা মানতে বাধ্য করে এবং যারা মানবে না তাদেরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচনা করে, সুতরাং এটি কী কুফর নয়?

'উসুলুছ ছালাছা' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله এর মন্তব্যের উপর টিকা লিখেছেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রধান ৫ ত্বওয়াগীতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ত্বগূত হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লহর নাযিলকৃত শরিয়াহ ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে।

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু ক্বাসিম আন নাজদি رحمه الله তার ফুটনোটে 'হাশিয়াতু ছালাছাতুল উসুল' (পৃষ্ঠা 99) এ মন্তব্য করেছেনঃ

“যে শাসক জাহিলি মনুষ্যসৃষ্ট/মানব রচিত আইন ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা শাসন করে, প্রকৃতপক্ষে এমন প্রত্যেকে যারা, আল্লহর নাযিলকৃত শারিয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে, তা ভিন্ন আইনের মাধ্যমে করা হোক বা নব উদ্ভাবিত কোন নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে, যা শারিয়াহ থেকে উদ্ভূত নয় বা এটি শারিয়াহ'র কোন হুকুম বলে জানা যায় না, তাহলে সে (ঐ শাসক) কাফির।”

আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সাবেক সদস্য আশ-শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু জিব্রীন (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

فهؤلاء الذين يحكم أكثرهم بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم كفار والعياذ بالله، وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من الوحيين، ولكن زهدوا فيها، ورموها خلف ظهورهم.

“বর্তমান সময়ে যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে, তারা কুফফার। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কেননা, তারা দুই ওহী থেকে প্রাপ্ত শরীয়াহর বিধানসমূহ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তারা এটিকে অবহেলা করেছে এবং তাদের পিছনে ফেলে দিয়েছে।”
[শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাওইয়্যাহ, ১০:৩৯]

খালিদ আলী আল-আনবারী রচিত "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير" (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন-তা ব্যতীত শাসন করা ও তাকফিরের মূলনীতি) বইটির বিরুদ্ধে স্থায়ী ফতোয়া কমিটির বিবৃতির অংশবিশেষ:

دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية.

তার দাবি হলো: "আহলুস সুন্নাহর ইজমা (ঐকমত) রয়েছে যে, "এমন ব্যক্তির মধ্যে কোনো (বড়) কুফরি নেই, যে তাশরীঈ-আল-আম (সাধারন আইন) এ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে, যদি না সে এটাকে অন্তরে বৈধ মনে করে, (এটি) অন্য সকল পাপের মত যা (বড়) কুফর চেয়ে ছোট।"

<u>এটি আহলুস সুন্নাহর উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ, যার উৎস অজ্ঞতা অথবা খারাপ উদ্দেশ্য।</u> আমরা আল্লাহর কাছে সুরক্ষা ও সুস্থতা কামনা করি।

[ফতোয়া নং-২১১৫৪; তারিখ ১০-২৪-১৪২০ হিজরি
আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমীয়াহ ওয়াল ইফতা, সৌদি আরব।]

***<u>Note:</u>*** সাধারণ আইন (التشريع العام) বলতে বোঝানো হয়, ব্যাপকভাবে জনগণের উপর প্রয়োগ হয়, সর্বজনীন আইন প্রণয়ন এবং তা জনগণ মানতে বাধ্য।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে হারামকে হালাল করে, কিংবা সর্বসম্মতিমে হালালকে হারাম করে, অথবা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরীয়াহকে

প্রতিস্থাপন করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।
[মাজমু আল ফাতাওয়া: ৩/২৬৭]

খ. মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন/বিচার করা: এর দুইটি ভাগ আছে:

১. সর্বদা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা: এটা ইসলামী শরীয়াত পরিবর্তনের শামিল। এই ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ শাকির (رَحِمَهُ اللّٰهُ) বলেন,

إن في الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لإخفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام ـ كأننا من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه– (عمدة التفسير لأحمد شاكر)

“মানব রচিত আইনের এই ব্যাপারটি সূর্যের আলোর মতো পরিস্কার। এটা পরিস্কার কুফর এবং এর মধ্যে লুকানো কিছু নেই, যারা ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, তাদের জন্য এ অনুযায়ী কাজ করা

অথবা এর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা একে স্বীকার করার কোন অজুহাত নেই, সে যে কেউ হোক না কেন। তাই সবাইকেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য দায়ী থাকবে। তাই আলিমরা পরিস্কারভাবে সত্যকে জানিয়ে দিবেন এবং কোন কিছু গোপন করবেন না, যা বলতে ইসলাম তাদেরকে নির্দেশ দেয়, তা বলে দিবেন।”
[উমদাতুল তাফসীর-মুখতাছার তাফসীর ইবনু কাসির : ৪/১৭৩-১৭৪]

২. শরীয়া আইন অপরিবর্তনীয় রেখে, ব্যক্তি স্বার্থে মাঝে মাঝে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা: এই ব্যক্তি এখনো মুসলিম, ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর প্রথম উক্তি এই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। সৌদি আরবের শারীয়াহ কাউন্সিলের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন,

وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر

والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة
(فتَاوى ورَسَائل) -)

“আর কুফর দুনা কুফর বলতে বুঝায়, যখন কোন বিচারক যে কোন ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করে এ অবস্থায় যে, সে জানে যে এ কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমটাই এ ক্ষেত্রে সত্য (অধিক কল্যাণকর) এবং এ কাজ তার থেকে একবার কিংবা এরূপ অল্প সংখ্যক বার প্রকাশ পায়। এই ব্যক্তি বড় কুফরী করেনি। আর যারাই আইন প্রণয়ন করে, অন্যদেরকে তা মানতে বাধ্য করে, সেটা কুফরী যদিও তারা ভুল হয়ে যাওয়ার দাবী করে, যদিও আল্লাহর আইনকেই অধিক সত্য মনে করে, এটা হচ্ছে এমন কুফরী যাতে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।”
[আল-ফাতাওয়া : ১২/২৮০]

গ. মানব রচিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা: এদের কেউ কেউ কাফির আর কেউ কেউ মুসলিম যারা ‘কুফর দুনা কুফর’-এ লিপ্ত। যদিও তারা আইন-প্রণয়ন কিংবা বিচার-ফায়সালা করছে না, কিন্তু তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন বাস্তবায়ন এবং

প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরের নিকটবর্তী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।” [সুরা-আন-নিসা: ৭৬]

---

<u>অতিরিক্ত দলীল***:***</u>

যদি কেউ ইসলাম অনুযায়ী শাসন করে তবে, তার প্রবৃত্তির কারণে কিছু আইন উপেক্ষা করে, সে ছোট কুফুরি করলো। যেমনঃ তার চাচাতো ভাই চুরি করলো, কিন্তু সে তাকে শাস্তি দিলো না, বরং সেটা না দেখার ভান করে বললো আমার চাচাতো ভাই চোর নয়।

সে যদি কিছু আইন উপক্ষা করে, যদি জিহাদ না করে, দখল অব্যাহত না রাখে, কিছু আইন বাস্তবায়ন না করে, মানুষকে শাসন করতে সৈন্য বা পুলিশ না পাঠায় কিংবা কিছু লোক অন্যায় করলে সেটার

বিচার না করে বা বিচার করতে অলসতা করে, এগুলো সবই ছোট কুফর।

কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর শারীয়াহর পরিবর্তে মানুষের আইন দিয়ে শাসন করে, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেছেন, এটা বড় কুফর। যা ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় (ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়)।

আবার কিছু ক্ষেত্রে এটা ছোট কুফুরী। যেমনটা রাসূল ﷺ এর হাদীসে বুঝা যায় যে, শাসনের এই এই বিষয়গুলো ছোট কুফর। সেগুলো আমাদের যুক্তি বা এমনিতেই ছোট কুফরি হয় নি।

নিয়ম হলো, যখন দলীলের মাঝে কুফর উল্লেখ থাকে, বিশেষ করে যদি আলিফ ও লাম ‘ال’ যুক্ত থাকে, সেটা বড় কুফর, যতক্ষণ না সেটা ছোট কুফর হওয়ার দলীল পাওয়া যায়।

যখন ইহুদীদের কুফরি শাসনের ব্যাপারে আয়াত নাজিল হলো, সেটা সন্দেহাতীতভাবে বড় কুফরি ছিল।

ইসলামের স্পষ্ট কোনো বিষয়ে "ইস্তিহলাল" তথা হারাম বিষয়ে বৈধতা দিলে সেটার ভিতরেই বড় কুফরী বিদ্যমান।

কিন্তু অনেক ধরনের আইন আছে যা আল্লাহ প্রদত্ত আইন নয়, কিন্তু আমরা দলীল অনুযায়ী জানতে পারি যে, সেগুলো ছোট কুফুরি। কোনো যুক্তির জন্য নয়, বরং দলীল এর জন্যই সেগুলো ছোট কুফুরি।

যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন, শাসক যদি তোমাকে প্রহার করে, তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়, তারপরও তুমি তাকে অনুসরণ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলাত প্রতিষ্ঠা করে। [সহীহ মুসলিম, ১৮৪৭]

তাহলে দলীল বলছে, শাসক যদি অত্যাচারীও হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলাহ প্রতিষ্ঠা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সে আল্লাহর আইনে শাসন করে নাই, কারণ আল্লাহ অত্যাচারী আইন করেন নি।

কাজেই যদি (অত্যাচারকে বৈধ না বানিয়ে) মানুষকে অত্যাচার করে, শারীয়াহর কিছু আইন উপেক্ষা করে বা অলসতা প্রকাশ করে কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, এগুলো সবই কুরআন-সুন্নাহর দলীল অনুযায়ী ছোট কুফুরি। কুফর দুনা কুফর।

যেমনটা অন্য এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি ইমাম সলাতে দেরী করে, তুমি সঠিক সময় আদায় করে নাও, পরে ইমামের সাথে নফল হিসেবে আদায় করো। (সংক্ষেপিত)
[Sahih Muslim 648c]
অথচ এটা (ইমামের দেরী করা) আল্লাহর আইনের বিপরীত, কিন্তু তারপরও এটা বড় কুফুরি নয়।

কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর শরীয়াহকে পরিবর্তন করে আইন করে বা তাগুতের আইনে শাসন করে, কিংবা "ইস্তিহলাল" বা আল্লাহর হারাম বিষয়কে বৈধতা দেয়, এসবই আল্লাহ প্রদত্ত আইনের পরিপন্থী শাসন এবং এসবের মধ্যেই কুফুরি বিদ্যমান।

বাহ্যিক বা প্রকাশ্য আমল দেখেই কাউকে বিবেচনা করতে হবে, আর আমরা এটাই করি। কারণ শারীয়াহতে কারো অন্তর দেখার মতো কিছু নাই।

আমরা কারো অন্তর দেখতে পাই না, কাউকে অন্তর দেখে বিচার করি না।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেন, আলিম বা দরবেশদের জন্য ইহুদিরা কখনো সলাত বা সিয়াম পালন করতো না, তবে যখন এসব আলিম ও দরবেশরা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল আর আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করলো, ইহুদিরা সে বিধান মেনে নিলো।

আল্লাহ যখন নিষিদ্ধ করেন, তারা বললো এটা হালাল। আল্লাহ যখন হালাল বলেন, তারা বলে হারাম। আর ইহুদিরা সেটা গ্রহণ করে নিতো। তাদেরকে মান্য করতো।

সেসব ইহুদিরা শুধু ইস্তিহলাল এর জন্যই মুশরিক না, আলিম ও দরবেশদের দেওয়া আল্লাহ পরিপন্থী আইন মান্য করার কারণে তারা মুশরিক।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,
“আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা ধর্মীয় নেতাদের রব হিসেবে গ্রহণ করে, তারা জানে যে তাদের ধর্মযাজক বা নেতারা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারপরও তারা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের হালাল করা বিষয়কে হালাল ও হারাম ঘোষণা করা বিষয়কে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তারা তাদের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। এটাকে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ শিরক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।” [মাজমুউল ফাতওয়া, ইবনু তাইমিয়াহ : ৭/৭০; পরিমার্জিত]

যখন তারা বলে আমরা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কোনো আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করবো, এটাকে বলা হয় ইস্তিব্দাল। যেটা বড় কুফুরি এবং আল্লাহর রুবুবিয়াতে শির্ক।

বরং সাহাবাগণ বলেছেন, ইহুদিরা জানতো যে আল্লাহ অন্য কথা বলেছেন, তারপরও তাদের আলিম-দরবেশদের কথা মান্য করেছে। এজন্য তারা কাফির হয়ে গেছে।

তাফসীর ইবনু কাসির ও তাফসীর কুরতুবীতে একটি হাদিস এসেছে, রাসূল ﷺ যখন জিজ্ঞেস করলেন, এই আইন কি তাওরাত থেকে এসেছে? তারা বললো, না। যখন ধনীরা জিনা করতো, আমরা তাদেরকে পাথর মারতাম না......

কিন্তু গরীব কেউ জিনা করলে পাথর মারতাম। তাই আমরা বললাম, চলো উভয়ের জন্যই আমরা আইন তৈরি করি। তারা কখনো বলেনি যে এই আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তারা বলেছে, আমরা এই আইন বানিয়েছি। আর এ কারণেই তারা কাফির হয়ে গেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

"যখন কেউ কোনো সুস্পষ্ট হারাম বিষয়কে হালাল বানাবে কিংবা সুস্পষ্ট হালাল বিষয়কে হারাম বানাবে কিংবা শরীয়াহর সুস্পষ্ট কোনো আইনের পরিবর্তে অন্য আইন বসাবে, ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে সে ব্যক্তি কাফির।"
[মাজমু' আল-ফাতওয়া ৩/২৬৭]

শারীয়াহ আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনে শাসন করার মানে হলো: শারীয়াহ আইনের বিপরীত আইন বানানো, (হারাম বিষয়কে) বৈধতা দেওয়ার সংস্থান, একটি পুলিশ বাহিনী যা এসব আইনকে রক্ষা করবে ইত্যাদি। কোনো কোনো শাসক তো এসব উল্লেখ না করে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে, তারা শরীয়ার চেয়ে মানুষের তৈরি আইনকে উত্তম বলে বিশ্বাস করে, এমনকি এটাকেই তারা শারীয়াহ মনে করে।

সেটা পরবর্তীতে একটি পাপ কাজ করাকে বৈধতা দেওয়ার আইন হয়ে যায়। যে আইনের মানে হলো, কেউ এমন পাপ করলে তাকে বাধা দিতে পারবে না, বাধা দিলে উল্টো বাধা দানকারীর শাস্তি হবে। শাস্তিটা এই আইন রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়।
আইন রক্ষা করা মানে হলো, এমন পাপ কাজে কেউ বাধা দিলে তাকে কারাগারে বন্দী করা যাবে!

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন বলেন,

“কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা কর না, তারা

কাফির।" কোনো নেতা যদি শারীয়াহ বিরোধী আইন জেনেও তার জনসাধারণের উপর এমন কোনো আইন বাস্তবায়ন করে, এবং বলে যে, সে তার তার আইন থেকে (শারীয়াহ আইনে) ফিরে আসবে না, সে অবশ্যই একজন কাফির।

তাতে সে যদি সালাহও পরে, দান-সাদকাও করে, সিয়ামও রাখে, হজ্জও করে, আল্লাহ'র ﷻ যিকিরও করে, রাসূল ﷺ এর নবুয়াতের সাক্ষীও দেয়, তবুও সে কাফির।”

ঐ ব্যক্তির কোনো ঈমান নেই যে আল্লাহর শারীয়াহকে ত্যাগ করলো কিংবা মানুষের তৈরি কোনো আইন বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে শারীয়াহকে পরিবর্তন করে দিলো, এমনকি যদি সে এটা বিশ্বাসও করে যে, আল্লাহর আইন-ই অধিক যুক্তিযুক্ত।

[শাইখ ইবনু বাজ, রিসালাত উযুব তাহকীম শারীয়াতাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৪৯, দারুল মুআলিম থেকে প্রকাশিত রিসালাত তাহকীম আল-ক্বাওয়ানীন]

প্রশ্ন: মুসলিমদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কী এমন একজনের মতো, যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা শাসন করে না?

শাইখ স্বালিহ আল ফাওযান: আল্লাহ যা নাযিল করেছেন-তা ব্যাতীত (অন্য কিছু দিয়ে) যে শাসন করে, সে মুসলিম নয়।

যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করে এবং শরিয়াহ বাতিল করে এবং এটিকে (অন্য) আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।

আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের বাহ্যিক আমল দেখে বিবেচনা করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, (অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের কথার পাশাপাশি) মানুষের কাজও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ বলেন, "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের বাহ্যিক আমল এর বিচার করতে।"
[সুনান আন-নাসাঈ ৩৭১৪]

ওমর বিন খাত্তাব (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ এর সময়ে ওহীর মাধ্যমে মানুষজন এর বিচার করা হতো, এখন আর ওহী আসবে না। তাই এখন আমরা আপনাদের বাহ্যিক আমল দ্বারা বিচার করবো। কেউ অপকর্ম করে বলবে যে, তার উদ্দেশ্য ভালো ছিলো, সেটা আমরা এখন বিশ্বাস করবো না।
[সহীহ বুখারী, ৩/৪৮/৮০৯]

বাহ্যিক আমলে বিচার: কাউকে যদি দেখা যায় একই সাথে ঈমান ও কুফুরি করতে, তার কুফুরি তার ঈমানকে বাতিল করে দেয়। একজন শাসক যে কালিমার সাক্ষী দেয় কিন্তু শরীয়া আইনে শাসন করতে অস্বীকার করে, এই অস্বীকার করার কারণে তার কালিমার সাক্ষী বাতিল হয়ে যায় (কাফির হয়ে যায়)।

মুরজিয়া এবং তাদের অনুসারী হলো তারা, যারা বলে ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে উচ্চারণ (কাজে পরিণত করা নয়)। আর যারা তাদের মধ্যে কট্টরপন্থী (কুররামিয়্যাহ), তারা বলে ঈমান শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই হবে (অন্তরে বিশ্বাস এবং কাজে পরিণত করতে হবে না)।

[শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, আশ-শারীম আল মাসলুল ৩/৯৬৪]

সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (رَحِمَهُ اللهُ) বলেন,

"(উক্ত আয়াতে) সালাহকে ঈমান বলা হয়েছে কারণ সালাহ এর জন্য প্রয়োজন হলো নিয়াহ করা, মুখে উচ্চারণ করা এবং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা। যখনি আমার এই আয়াতটি মনে পরে, মুরজিয়াদের ঐ কথাটাও আমার মনে পরে, তারা বলে, 'সালাত ঈমানের অংশ নয়'।"
[তাফসীর আল-কুরতুবী, ২/১৫৭]

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (رَحِمَهُ اللهُ) বলেন:

"ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজের সমষ্টি, যা বাড়ে এবং কমে।"
[ইমাম ইবনু আব্দিল-বার এর কিতাবুল-ইনতিকা, ৩৪]

ইমাম শাফেঈ বলেন, "সাহাবী, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, ঈমান হলো

১) মুখে উচ্চারণ,
২) কাজে পরিণত করা এবং
৩) অন্তরের বিশ্বাস

বিশ্বাস, এগুলোর একটি ছাড়া আরেকটি হতে পারে না।"
[মাযমু' আল-ফাতাওয়া, ৭/২০৯]

এজন্য মুরজিয়াদের কথা হলো, একজন শাসক (এবং অন্য যে কেউ) যা খুশি তা করতে পারে, শারীয়াহ আইনের অবাধ্য হতে পারে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে, এবং তাদের এক্ষেত্রে অযুহাত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমান আছে।

শাইখ বিশর ইবনু ফাহাদ আল-বিশর বলেন,

মুরজিয়া আলেমদেরকে চুপ থাকতে দেখা যায় যখন অধিকাংশ মুসলিম ভূমিগুলোয় শাসকেরা শারীয়াহ বাদ দিয়ে অন্য আইনে শাসন করে। কারণ, তাদের

মতে এর দ্বারা ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। আল্লাহর কসম, এটাই তাদের হক্ক থেকে বিচ্যুতি।

আবু বকর জাকারিয়া বলেন,

“আমাদের সময় যারা মানুষের তৈরি সংবিধান দ্বারা বিচার ও ফয়সালা করে, এই জাতীয় জর্জগুলো বিপদে আছে। বিপদ মানে তাদের ঈমান থাকবে না। যদি জেনে শুনে তা করে।

অনেকে আছে জানেনা। তাদের অনেকে আল্লাহর ﷻ যে বিধান আছে তাও জানিনা। না জানাটা তাদের জন্য ওজর না কিন্তু।

কারণ তাদের জানার সুযোগ আছে। বই পড়তে পারে। কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে। না পড়লে, পড়তে হবে। আল্লাহর আদেশ। যে মুসলিম দাবি করে সে ব্যক্তি কখনো না জানা দিয়ে ওজর দিতে পারবে না।

জেনেশুনে কোন জর্জরা আল্লাহর বিধানের বাইরে কোন কিছু দিয়ে বিচার করে, সে কাফির হয়ে যাবে।

পরের হাত কাটা আল্লাহ বিধান দিয়েছেন, ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা বা ১০০ টি বেত্রাঘাত করা, মদ পানকারীকে আশিটা বেত্রাঘাত করা, এগুলো নির্ধারিত কুরআন সুন্নাহয়। এই নিয়মের বাইরে চলে, ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে সে কাফির। চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যদি না তওবা করে ফিরে আসে।

এই বিধান যারা মানবে তারাও কাফির হয়ে যাবে। আলিমরা এ ব্যাপারে একমত।"

শাইখ সালমান আল আওদাহ বলেন,

"ইমাম ইবন কাসির তার বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে এমন ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে ইজমার (মতৈক্য) কথা উল্লেখ করেছেন যে, তা বড় কুফর।

ইমাম ইবনু বায: হয়তো তিনি উদ্দেশ্য করেছিলেন, যখন সে তা শারীয়াহর সাথে সম্পৃক্ত করে (তখন এটি বড় কুফর হবে)।

সালমান আল-আওদাহ: না! তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে, যদি তা এমন আইনও হয় যা আল্লাহ নাজিল করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়েছে, তাহলে সে কাফির।" তাহলে তার ব্যাপারটা কেমন হবে, যে বিচার করে তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা, মানুষের মতামত দ্বারা? নিঃসন্দেহে সে একজন মুরতাদ!

সালমান আল-আওদাহ: অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি পাপকাজকে মানুষের ওপর বিধিবদ্ধ আইন বানায়, তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা তারা বলে, সে শারীয়াহকে অপসারণ ও বিতাড়ন করেছে এবং তদস্থলে একটি বিধিবদ্ধ সংবিধান প্রণয়ন করেছে, এই কর্ম করা সত্ত্বেও এটা কল্পনা করা যায় না যে, সে একজন ফাসিক মুসলিম। যদিও সে বলে যে, সে এটা হালাল মনে করে না। এরকম কল্পনা করা যায় না। হয় সে তা (শারীয়াহকে বিতাড়ন করে তদস্থলে সংবিধান প্রণয়ন করা) হালাল মনে করে, অথবা তা মানুষের জন্য অধিক উত্তম মনে করে, অথবা অনুরূপ কিছু। তারা এই লোকের সাথে ওই ব্যক্তির পার্থক্য করে, যে কোনো একটি নির্দিষ্ট

মুকদ্দমায়  ঘুষ গ্রহণ করে বা স্বজনপ্রীতি করে রায় দেয়।

সালমান আল-আওদাহ: সম্মানিত শাইখ, আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) তার পুস্তিকায় বলেছেন, “যেসব রাষ্ট্র নিজেদের বানানো সংবিধান দিয়ে বিচার করে, সেগুলো কাফির রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্র থেকে হিজরত করা ওয়াজিব।"

ইমাম ইবনু বায: তিনি (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) তার পুস্তিকায় বলেছেন যে, "তিনি মনে করেন- এর বাহ্যিক অবস্থাই কুফর। কেননা তাদের দ্বারা সংবিধান প্রণীত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তারা এতে সন্তুষ্ট এবং এই কাজকে হালাল জ্ঞানকারী।" আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তার ওপর রহম করুন। (আমিন)

সাইয়্যিদ কুতুব (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন, “তাগুত বলতে সেইসব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহ ﷻ নির্দেশিত বা তার দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে উদ্ভূত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও

রীতিনীতির ভিত্তিতে এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।” [তাফসীরে ফি যিলালিল কুরআন]

ইমাম মালিক (رَحِمَهُ اللَّهُ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ “এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহকে ﷻ বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।” [ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী]

মুজাহিদ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন: 'তাগুত হল মানুষরুপী এক শয়তান যাদের কাছে মানুষ আসে বিচার পাওয়ার জন্য এবং মানুষরা তাদের অনুসরণ করে।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন:

"এ কারণে যে কিনা বিচার করে কোরআনের হুকুম ছাড়া তারা তাগুত।" [মাজমু'আল ফাতাওয়া-২৮খন্ড, ২০১পৃষ্ঠা]

ইবনু আল কাইয়্যুম (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেছেন: "তাগুত হল সীমালঙ্ঘনকারী। যদিও কিনা সে ইবাদত করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাই সমাজের মধ্যে তাগুত সেই ব্যক্তি যাকে সমাজের লোকেরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের ﷺ পাশে বিচারক হিসেবে স্থান

দেয়, অথবা আল্লাহ ﷻ ব্যতীত, তার ইবাদত করে অথবা আল্লাহর ﷻ নির্দেশনা উপেক্ষা করে, তার অনুসরণ করে অথবা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করে।"
[ই'লাম আল-মুওয়াক্কী'য়ীন-প্রথম খন্ড-৫০পৃষ্ঠা]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব (رَحِمَهُ اللَّهُ) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে:

১. শয়তান: গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান;

২. শাসক: আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসক;

৩. বিচারক: আল্লাহর ﷻ নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার ফায়সালা করে;

৪. গনক, জ্যোতিষি: আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি ইলমুল গায়েব জানে বলে দাবী করে;

৫. পীর-ফকীর, দরবেশ, প্রবৃত্তি, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رَحِمَهُ اللّٰهُ) আরও বলেন, “যারা আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করে এবং নতুন আইন প্রণয়ন করে, তার আইন বাতিল, এটির অনুসরণ করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, “তাদের কি এমন কোনো শরিক দেবতা রয়েছে যারা তাদের জন্য বিধান তৈরি করছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” আর এ কারণেই ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানরা কুফরি করেছিল। কারণ তারা আল্লাহর শারীয়াহর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত বা পরিবর্তিত এবং বাতিল বা রহিত আইনের আনুগত্য করেছিল।”
[মাজমুউল ফাতওয়া, ৩৫/৩৬৫]

ইমাম মুহাম্মাদ আল আমিন আশ শানকিতি (رَحِمَهُ اللّٰهُ) বলেন, “আল্লাহ তার কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না, এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর আইনের বিপরীতে ভিন্ন কিছুর ভিত্তিতে যারা আইন তৈরি করে, তাদের অনুসারীরা মুশরিক। তারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করেছে। সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা

প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হলো, আল্লাহ ﷻ ও তার রাসুলের ﷺ আনীত শারিয়াহর পরিবর্তে যারা শাইতানের প্রণীত ও মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।” [আদ্বওয়াউল বায়ান : ৪/৯১-৯২]

আল্লাহ তায়ালা খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেন, “তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।” [সূরা তাউবা: ৩১]

আয়াতটি শোনার পর সাহাবি আদি ইবনু হাতিম যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা তো আমাদের ধর্মযাজকদের ইবাদত করতাম না। তখন রাসুল ﷺ বললেন, আল্লাহ যেসকল বিষয়বস্তুকে হারাম করেছেন তোমাদের ধর্মযাজকরা সেগুলোকে হালাল ঘোষণা করতো, আবার আল্লাহ যেসব বিষয়কে হালাল করেছেন তোমাদের ধর্মযাজকরা সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করতো, আর তোমরাও তা মেনে নিতে। এই মেনে নেওয়াই হচ্ছে ইবাদত।”
[সূরা তাওবাহ : ৩১ এর তাফসির ; তিরমিযি : ৩০৯৫]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে বিচার করাকে বৈধ মনে করে, সে কাফির।” [মাজমুউ'ল ফাতওয়া, ৩/২৬৮]

কেউ কেউ ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) এবং অন্যান্য ইমামদের কিছু খণ্ডিত বক্তব্য টেনে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা কুফর নয়।

এরা বিদআতিদের মতো শুধুমাত্র সেই দলীলই গ্রহণ করে, যা তাদের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দলীল ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু এর প্রেক্ষাপট সামনে আনে না। বরং ইমামদের বক্তব্যকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে, যা কখনোই সালাফদের মানহাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ:

ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেন, “যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যে তা স্বীকার করবে, কিন্তু সেটি অনুযায়ী ফায়সালা করে না, সে জালিম ও ফাসিক হবে।”
[তাফসিরুত তাবারি : ৪/৫৯৭]

[উক্ত উদ্ধৃতি সহীহ হবার ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে আলি ইবনু আবি তালহা ইবনু আব্বাস থেকে উক্ত তাফসির বর্ণনা করেন নি। তবে ইমাম ইবনু কাসির তাফসির ইবনু কাসিরে এবং ইমাম ইবনু জাওযি যাদুল মাসার ফি ইলমিত তাফসিরে উক্ত আসারের সনদকে সহীহ বলেছেন।]

তাবিঈ ইকরামাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) (১০৫ হিজরী) বলেন,

"যে আল্লাহর আইন জারি করে না, অস্বীকার করে সে কাফির। আর যে তা স্বীকার করে কিন্তু সেটি অনুযায়ী ফায়সালা করে না সে জালিম ও ফাসিক।"
[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪ এর তাফসির, তাফসিরুল বাগাভী]

তাবিঈ আতা বিন আবী রাবাহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) (১১৫ হিজরী) বলেছেন,

"এই আয়াতে ছোট কুফর, ছোট জুলম ও ছোট ফিসক উদ্দেশ্য।"
[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪ এর তাফসির, তাফসিরুল খাযিন; তাফসিরুল বাগাভী]

তাবিঈ ইবনু তাউস (১০৫ হিজরী) বলেন, "এটা কুফর, তবে ওই কুফর নয় যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের

করে দেয়। এটা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসের মতো কুফর নয়।”
[সূরা মায়িদা ৪৪ এর তাফসির, তাফসিরে খাযিন]

তাবিঈ মুজাহিদ ইবনু জাবর (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) (১০৪ হিজরী) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবকে বাতিল গণ্য (রদ) করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে শাসন ও বিচার করা ছেড়ে দেয়, সে কাফির, জালিম, ফাসিক।”
[তাফসিরে কুরতুবি; মুখতাসার তাফসির আল খাযেন, ১/৩১০]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন, “ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে উক্ত আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “এটা এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।”
[মাজমুউল ফাতওয়া, ৭/২০৪]

ইমাম ইসমাইল ইবনু সাদ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন, “ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা

কুফর তবে ইসলামের মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে না।”
[সুয়ালাত ইবনু হানী, ২/১৯২]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা ফরয বলে বিশ্বাস করে না, সে কাফির। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের অনুসরণ বাদ দিয়ে নিজের মতানুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করাকে বৈধ ও ইনসাফপূর্ণ মনে করে সেও কাফির।

অনেক লোকই ইসলাম মানা সত্ত্বেও নিজেদের অনুকরণীয় নেতাদের আদেশে প্রচলিত নিয়মে বিচার ফায়সালা করে। এসকল লোকেরা মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করা হারাম জানা সত্ত্বেও যদি আল্লাহর বিধান না মানে বরং ইসলামি আইনের বিপরীত আইন দিয়ে বিচার করাকে বৈধ মনে করে, তাহলে তারা কাফির।”
[মিনহাজ আস সুন্নাহ, ৫/১৩০-১৩২]

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“কোনো বিচারক বিশ্বাস করে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা ফরয, এর অন্যথা করলে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সেই বিচারক অবাধ্যতাবশত আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে এমন ব্যক্তি ছোট কুফরে লিপ্ত। কিন্তু এমন বিচারক যে বলে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তার নিজের ফায়সালাই শেষ কথা। তাহলে এমন বিচারক বড় কুফরে লিপ্ত অর্থাৎ কাফির।” [মাদারিজ আস সালিকিন: ১/৩৩৬]

ইমাম ইবনু আবিল ইয (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“বিচারক যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করা ওয়াজিব নয় বরং সে এ ব্যাপারে স্বাধীন অথবা সে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তা তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহলে এটা হবে বড় কুফর।” [শারহু আকিদাতুত তহাবিয়াহ: ৩৬৩-৩৬৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন,

“মানুষ যখন ঐকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল বানায় অথবা হালালকে হারাম বানায় কিংবা ঐকমত্যপূর্ণ আল্লাহর শারীয়াহর আইন পরিবর্তন করে, তখন সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রেই আল্লাহর বাণী নাযিল হয়েছে, ‘আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেটি অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির।” [মাজমুউ'ল ফাতওয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৭]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহিম (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন, “যেকেউ আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইনকানুন তৈরি করে ও তা মেনে চলে তখন সেটা অবশ্যই বড় কুফর বলে বিবেচিত হবে, যদিও সে একথা বলে যে এর কারণে আমি গুনাহগার হয়েছি এবং শারিয়াহর বিধানের ফায়সালাই অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ।”
[ফাতওয়া ওয়া রাসায়িল, ১২/২৮০]

ইমাম ইবনু আবিল ইয (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলেন, “এখানে একটি বিষয় রয়েছে, যা ভালো করে বুঝা উচিত। তা হলো আল্লাহ যা নাযিল করেননি সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করলে, তা এমন কুফরি হতে পারে যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এটা

বিচারকের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। বিচারক যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করা ওয়াজিব নয়, বরং সে এ ব্যাপারে স্বাধীন অথবা সে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তা তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহলে এটা হবে বড় কুফর।”
[শারহু আকিদাতুত তহাবিয়াহ: ৩৬৩-৩৬৪]

লক্ষ্য করুন, এই সবগুলোই 'কুফর দুনা কুফর' এর দলীলসমূহ। কোথাও কিন্তু মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করার কথা উল্লেখ হয়নি। সাহাবাগণ এবং তাবেঈ ইমামদের সময়ে এটা ছিলই না যে, কেউ আল্লাহর আইন পুরোপুরি বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করবে। অতএব, তারা যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সেটা শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য যখন, আল্লাহর শারীয়াহ জারি থাকে এবং বিচারক কখনো কখনো ভয় বা লোভ অথবা উদাসীনতার জন্য আল্লাহ আইনে বিচার করে না। 'তাবিঈ ইকরামাহ' (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) এর উক্তিটি খিয়াল করুন, যে আল্লাহর আইন জারি করে না, সে অস্বীকার করে। আর স্বীকার করার শর্ত হলো আইন জারি থাকতে হবে। আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা বিচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, 'আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন না করা' এটা একটা বিষয়, যেটাকে ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেছেন 'কুফর দুনা কুফর'। কিন্তু 'আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান কে শারীয়াহর উৎস বানিয়ে তা অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার করা' এর মাঝে পার্থক্য আছে। আব্দুল্লাহ আযযাম ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন ইমামই মানবরচিত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা কারীকে ছোট কুফর বলেন নাই। এটা অসম্ভব। এটা বলার কোন অধিকারও তাদের নাই। কারণ এটা কুরআনের প্রকাশ্য সুস্পষ্ট আয়াতের বিপরীত।

যদি কেউ মনে করে আল্লাহর বিধানই শ্রেষ্ঠ তাহলে সে কি এমন বিধানের অনুসরণ করতে পারে যা আল্লাহর বিধানকে উঠিয়ে দিচ্ছে**?**

যেমন: আপনি বললেন সালাহ পড়া ভালো কিন্তু সালাহের বিরোধিতা করলেন। বললেন, সালাহ পড়া যাবে না! হইলো?

সুতরাং, বোঝা গেল এটা হলো অবাস্তব কথা। অন্তরে বিশ্বাসের কথা কোথায় প্রকাশ পাবে? তার কর্মকাণ্ডে। আমাদের কাছে ঈমান শুধু অন্তরে বিশ্বাসের নাম নয়। বরং আমাদের কাছে ইমান -অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও তদনুযায়ী আমল করা। ইমানের জন্য এই তিনটা একত্রে থাকতে হয়। এর একটা না থাকলে সে মুমিন থাকে না।

এমনকি অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও মানুষ কাফির হয়, যেমন: কেউ যদি কবরে সিজদা দেয়? কেউ যদি মাজারে মানত করে? এভাবে যারা মনে করে কাফির হওয়া শুধু অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তারা তো এখনও আশআরী রয়ে গেছে! মাতুরিদি রয়ে গেছে! এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আকিদাহ না। সুতরাং এই কথা যারা বলে তারা পথভ্রষ্ট মুরজিয়া। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কঠোরভাবে বলেছেন, যারাই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করে, তারাই কাফির।
শুধু কাফির না ত্বাগুত। এরা বুঝে নিক, আখিরাতে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।

<u>الحمدلله رب العالمين</u>

এই প্রচেষ্টা থেকে যে কোন উপকার পাওয়া যায়, তা একমাত্র আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে, আর এতে যে কোন ভুল বা ত্রুটি পাওয়া যায়, তা আমার ভুল এবং ত্রুটির কারণে।

**(সংক্ষেপিত)**